# আচার্য্য জগদীশ প্রসঙ্গ

শ্রীহরিদাস মজুমদার সম্পাদিত

১ম সংস্করণ

ভাদ্র, ১৩৪০

মৌনব্যাখ্যা-প্রকটিত-পরব্রহ্মতত্ত্বং যুবানং
বর্ষিষ্ঠান্তেবসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ ।
আচার্য্যেন্দ্রং করকলিতচিন্মুদ্রমানন্দরূপং
স্বাত্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্ত্তিমীড়ে ॥

লেখকগণ—

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরিমোহন গোস্বামী,
৺ললিতমোহন দাস, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীঅক্ষয়-
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী মণিকুন্তলা
সেনগুপ্তা, শ্রীঅন্নদাচরণ রায়,
শ্রীহরিদাস মজুমদার

# পরিচয়

সৌভাগ্যক্রমে বরিশালের আচার্য্য জগদীশের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। তিনি আজ অমৃতলোকের অধিবাসী। তাঁর ভক্তেরা তাঁর জীবনকথা সাধারণ্যে প্রচার কর্ত্তে প্রয়াসী হয়েছেন। সাধু মহাপুরুষদের জীবন-কথা লোকসমাজে যত প্রচারিত হয়, সমাজের কল্যাণ-সম্ভাবনা ততই বেশী। আচার্য্যদেবের ভক্তদের এই সাধু প্রচেষ্টা সফলতায় ভরিয়া উঠুক।

কুটীরাশ্রমবাসী আচার্য্যদেবকে দেখে পুরাণ-ভারতের ঋষি-চরিত্রের একটা মধুর স্পর্শ যেন আমার মনে পেয়েছিলাম। তবু আজ বারবার মনে সন্দেহ জাগচে—আমার দেখা ঠিক হয়নি—আমি যা দেখেছি, তার পরে হয়ত আরও অনেক কিছুই না-দেখা রয়ে গেছে।

আমাদের এক চোখের দেখা যেমন সম্পূর্ণ নয়, অভ্রান্ত নয়, একার দেখাও তেমনি ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ। আমার দৃষ্টি তখনই সম্পূর্ণ ও সত্য হয়ে ওঠে, যখন বিশ্বের সকলের দৃষ্টির সঙ্গে আমার দৃষ্টি মিলিত করে দেখতে পাই। চোখ আছে, দৃষ্টিশক্তিও তার বিলক্ষণ, তথাপি দর্শনীয় অনেক কিছুই যে না-দেখা রয়ে যায়, এ সত্য বহুবার আমি আমার রসায়নাগারে প্রত্যক্ষ করেছি। দেখা এবং না-দেখা এই দুইকে মিলিয়ে অরূপের যে-রূপ চোখের কাছে ধরা দেয় তারি নাম সত্যদৃষ্টি বা দর্শন। এই দর্শন বলে যাকে আমরা না দেখি, তাকে সত্য করে দেখা হয় না।

আচার্য্যদেবের যে চরিত-কথা আজ লোক সমাজে প্রচার হতে চলেছে এর বিশেষত্ব—এ কোন এক ব্যক্তির লেখা নয়। তাঁর ভক্তেরা তাঁর মধুর বাণী শুনে, তাঁর নিত্যকার জীবনের সংস্পর্শে এসে, তাঁর সেবা করে, স্নেহ ভালবাসা পেয়ে, শাসন পেয়ে, তাঁর কাছে শিক্ষা দীক্ষা লাভ করে, যিনি যে ভাবে দেখেছেন তিনি সেইভাবে তাঁর জীবন কথাকে এঁকে দিয়েছেন। এই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টির সংযোজনায় যে জীবন ব্যক্ত হয়ে উঠেছে সে জীবনে তাঁকে সম্পূর্ণ করে হয়ত পাওয়া যাবেনা তবু সেই হবে সম্পূর্ণের কাছাকাছি। মহাসাগরকে কেউ দেখেছেন, কেউ তার নাম শুনেছেন—কেউ জানেন তার জল লোনা, কেউ জানেন তার পারাপার নেই, কেউ জানেন তার দৃশ্য মহান্, কেউ জানেন তার বুকে রুদ্রের প্রলয়ঙ্কর নৃত্য, আবার কেউ জানেন তার বুকে কত মাণিক লুকোন রয়েছে—এই সবার জানাজানিকে নিয়ে যে জানা না-জানার স্বরূপ ব্যক্ত হয়, সেই হ'ল মহাসাগর।

আচার্য্যদেবের যে অনাড়ম্বর যোগযুক্ত জীবন সহস্র সহস্র লোকের হিত সাধন করেছে, তাঁর জীবন-কথাও সেই হিতকেই অবিনশ্বর করে তুলবে।

সায়েন্স্ কলেজ, কলিকাতা
১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

# সম্পাদকের নিবেদন

হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিয়া সাধু সন্ন্যাসীরা জগতের কি উপকার করিতেছেন?—এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "মানুষ দেখে না, কিন্তু dynamo হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন ও বিচ্ছুরিত হইয়া জগতের কত উপকার করিতেছে, তেমনি এই সাধু সন্ন্যাসীদের উচ্চ চিন্তাধারা জগতকে আলোড়িত করিতেছে, লক্ষ লক্ষ মানবের জীবন উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।"

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের জীবনও নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু সহস্র সহস্র নরনারী এই জীবনের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে, এই জীবনের আলোকে সংসার-গহনে পথের রেখা দেখিতে পাইয়াছে।

যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহারা আচার্য্যদেবকে যেমন দেখিয়াছেন, বুঝিয়াছেন ও উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ হইলে এই দুরবগাহ জীবনের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে অন্যূন পঞ্চাশ জনের লেখা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সেই লেখার কতকগুলি 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহার কয়েকটি মাত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল। জীবনালেখ্য চিত্রিত করিবার এই অভিনব পদ্ধতি যদি পাঠককে

আনন্দ দান করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে বাকী লেখাগুলিও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা আছে।

এই গ্রন্থ আচার্য্যদেবের জীবনচরিত নহে, জীবন চরিতের সূচী মাত্র। বাতায়নের মধ্য দিয়া যেমন আমরা অনন্ত আকাশের আভাস পাই, সমগ্র আকাশ দেখিতে পাই না, এই গ্রন্থে তেমনি আচার্য্য-দেবের মহৎ, উদার, অতুলনীয় চরিত্রের আভাস মাত্র পাওয়া যাইবে।

এই পুস্তকের উপস্বত্ব বরিশালের 'জগদীশ আশ্রমের' সেবায় নিবেদিত হইল।

নিবেদক

শ্রীহরিদাস মজুমদার
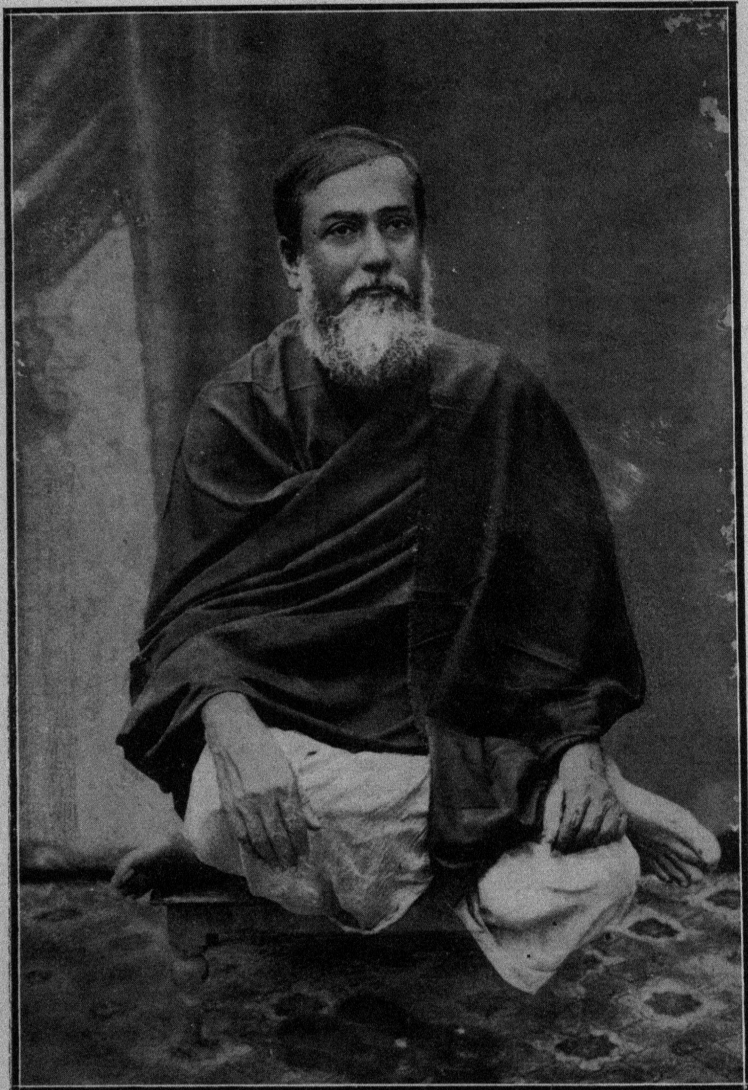
আচার্য্য জগদীশ

# আচার্য্য জগদীশ প্রসঙ্গ

## জীবন প্রভাতে

পূজ্যপাদ আচার্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় ১২৬৮ সালের ১৮ই ভাদ্র তারিখে, খুলনা জেলার অন্তর্গত বারুইখালি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার, এক এক বেলায় পঞ্চাশ ষাট খানির উপরে পাতা পড়িত। তাঁহার পিতা একমাত্র কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার পিতামাতা ও খুল্লতাত সকলেই অত্যন্ত ভগবৎভক্ত ও হিন্দুধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তাঁহারা সকলে প্রকৃত আদর্শ হিন্দু ব্রাহ্মণের জীবন যাপন করিতেন। সেকালের তুলনায় তাঁহারা অত্যন্ত উদার ছিলেন। তাঁহাদের আদর্শে, সংসর্গে ও তত্ত্বাবধানে, বিশেষতঃ তাঁহার মাতার আদর্শে, জগদীশের বাল্যজীবন গঠিত হয়। শিশুকাল হইতেই জগদীশের গুরুজনে ভক্তি, বিশেষতঃ মাতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি জীবনে কখনও মাতৃবাক্য লঙ্ঘন করেন নাই। ধর্ম্মানুরক্তি লইয়াই যেন তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি গ্রাম্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে প্রথমে অধ্যয়ন করেন। সে সময় সাহিত্যেই তিনি খুব উৎকৃষ্ট ছিলেন, অঙ্কে কাঁচা ছিলেন। কিন্তু প্রবল অধ্যবসায় গুণে তিনি এই ত্রুটী সংশোধন করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। এই বয়সেই তাঁহাতে অসাধারণ ধীশক্তি দেখা

গিয়াছিল। শিক্ষাবিভাগের কোন উচ্চপদস্থ সাহেব পরিদর্শক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ধান্যের নাম লিখিতে আদেশ করেন। যখন অন্যান্য ছাত্রবৃন্দ দুই একটী ধান্যের নাম লিখিয়া আরও নূতন নাম স্মরণে আনিবার জন্য চিন্তা করিতে ছিল, তখন জগদীশ শতাধিক ধান্যের নাম লিখিয়া পরিদর্শক মহোদয়কে যারপরনাই সন্তুষ্ট করিয়া কতকগুলি মূল্যবান্ পুস্তক ও অন্যান্য কয়েকটী জিনিষ পুরস্কার লাভ করিয়া ছিলেন। অথচ সে সময় তিনি বাস্তবিকই ধান্যের নাম এবং তাহার জাতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন।

সেই বাঙ্গালা বিদ্যালয় হইতে তিনি বৃত্তি লাভ করিয়া যশোহর জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। তিনি সেই সময় তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র ৺শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে কসবায় এক বিধবা মহিলার গৃহে থাকিতেন ও মাসিক টাকা দিয়া খাইতেন। শ্রীশচন্দ্র তাঁহার দুই বৎসরের বড় ছিলেন। আজন্ম সুহৃদ্, নিত্যসহচর ও সহপাঠী শ্রীশচন্দ্র জগদীশের একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করিতেন ও একত্র শয়ন করিতেন। শ্রীশচন্দ্র ছোট ভাইকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। জগদীশ অত্যন্ত দুর্ব্বল ও রুগ্ন ছিলেন। তাঁহাকে ঘন ঘন পাইখানায় যাইতে হইত, এইসময় শ্রীশচন্দ্র তাঁহার জল দেওয়া, কাপড় কাচা সমস্তই করিতেন। যাঁদের ঘরে দু'ভাই থাকিতেন, তাঁহারা এত মিতব্যয়ী ছিলেন যে শ্রীশ ও জগদীশের আহারের অন্ন কখনও কম বই সমান বা বেশী হয় নাই। শ্রীশচন্দ্র নিজে কম খাইয়াও ছোট ভাইয়ের যাহাতে কম না পড়ে তৎবিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। জগদীশ কিন্তু উত্তরকালে যখন উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছিলেন তখন সেই বিধবা পরিবারকে যথাসাধ্য সাহায্য পাঠাইতেন। ইহা দেখা গিয়াছে যে জীবনে তিনি যদি কখনও কাহারও নিকট সামান্য

মাত্র উপকার পাইয়াছেন তবে তাহাকে বহুগুণ প্রত্যর্পণ করিয়াও তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতেন।

জগদীশকে বুঝিতে হইলে তাঁহার মাতার জীবনী জানা অত্যাবশ্যক। তাঁহার মাতার আদর্শেই যেন তাঁহার জীবনটা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত চালিত হইয়াছিল। তাঁহার দৃঢ়সংকল্প, ভগবদ্‌ভক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সংযম লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিত; স্বাস্থ্যের অভাবে কর্ম্মযোগী হইতে পারেন নাই।

যশোহর হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সম্মানসহকারে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভকবতঃ কলিকাতায় মেট্রোপলিটান কলেজে তিনি ও শ্রীশচন্দ্র ভর্ত্তি হন। দুই ভাই একসঙ্গে এফ,এ, পাশ করেন। জগদীশ বৃত্তি লাভ করেন ও দুই ভাই একসঙ্গে ঐ কলেজে বি,এ, ক্লাশে ভর্ত্তি হন। জগদীশ সংস্কৃতে অনার্স সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু শ্রীশচন্দ্র অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। পরে তিনিও পাশ করিয়া জগদীশের ন্যায় বরিশালে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। শ্রীশচন্দ্র 'ল' পাশ করিয়া ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলে দুই ভাইকে পৃথক্ স্থানে থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু ছেলেবেলাকার ভালবাসার দৃঢ় বন্ধন শেষকাল পয্যন্তও শিথিল হওয়ার অবসর পায় নাই। গত বর্ষার শেষে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। হায়! বোধ হয় নিত্যসহচর জগদীশকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছিলেননা, তাই তাঁহাকে ডাকিয়া সঙ্গী করিয়া লইলেন।

জগদীশের মাতৃ ও পিতৃবংশ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রাম্য সামাজিক জীবনের তুলনায় অত্যন্ত উদার ও অনেকটা আধুনিক ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার মাতা সমস্ত অতিথির, সে যতই নিম্নতরজাতি হউক না কেন, উচ্ছিষ্ট নিজ হাতে পরিষ্কার করিতেন এবং

আতুর ও রুগ্ন যে কোন ব্যক্তির মলমূত্র মুক্ত করিতেন। রোগীর সেবা শুশ্রূষা, ঔষধ পথ্য দান, অতিথি সেবা ও পূজার সময় দরিদ্র প্রতিবেশীদের বস্ত্রদান তাঁহার পিতৃবংশের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। পিতৃ মাতৃ উভয় বংশই ধর্ম্মানুরক্ত, সন্ধ্যাআহ্নিকপূত ছিলেন। ছেলে বয়সে জগদীশ দুধ চিনি ভালবাসিতেন। একদিন অতিথিদের খাওয়াইবাব কালে (অন্ততঃ চারি পাঁচ জন অতিথি না হইত এমন দিনই যাইত না) ঘরে বেশী চিনি না থাকায় তাহাদের গুড় দেওয়া হয়। অতিথিরা উঠিয়া গেলে জগদীশ তাহাদিগকে চিনি না দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা কবিয়া জানিতে পারেন, যে তিনি চিনি ভালবাসেন ও ঘবে বেশী চিনি নাই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। তখন তিনি ঘর হইতে চিনির পাত্র লইয়া আসিয়া এটো পাতা ফেলিবার জায়গায় "খা, জগা, চিনি খা" "খা, জগা, চিনি খা" বলিয়া সমস্ত চিনি ঢালিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ঐ অল্প বয়সেই তাঁহার নির্লোভিতা ও অতিথিসংকারপ্রিয়তা দেখিয়া তাঁহার মাতা ও খুল্লতাতরা আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাঁহাদের একান্নভুক্ত বৃহৎ পরিবার ছিল। তদুপরি একজন বৈদ্য কবিরাজ, একজন শিক্ষক, একজন গোমস্তা, সাত আট জন চাকর ও প্রত্যহ অনেকগুলি অতিথি খাইতেন। পাছে অকুলান হয় এজন্য পঠদ্দশা হইতেই গ্রীষ্মাবকাশে কিম্বা ৺পূজার বন্ধে বাটী আসিলেই গোলায় কত ধান চাউল মজুত আছে তাহার খোঁজ করা একটা অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল। প্রকৃত অভাবগ্রস্ত বুঝিলে নিজেকে রিক্ত করিয়া যথাশক্তি কোন ব্যক্তির অভাব পরিপূরণের অভ্যাস তাঁহার শিশুকাল হইতে মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত সমান ছিল। ঘরের লোক হইতে বাহিরের লোকের

মা

জন্য তাঁহার প্রাণ যেন আরও বেশী কাঁদিত। গত দুইবারের ভীষণ ঝড়ে তাঁহার দেশের বহুলোক গৃহশূন্য হইয়া তাঁহার নিকট প্রচুর অর্থ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন।

কেবল মিথ্যাকেই তিনি জগতে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করিতেন। অত্যন্ত দোষ করিয়াও তাঁহার নিকট দোষ স্বীকার করিলে মাপ পাওয়া যাইত। কিন্তু মিথ্যাবাদীর মাপ ছিল না।

ছেলেবেলা হইতেই তিনি বিবাহ না করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। পাছে মা তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ উপরোধ করেন এই ভয়ে, তিনি যে বিবাহে বীতস্পৃহ, এইভাব কথায় বার্ত্তায় দৃষ্টান্তে মাতাকে প্রায়ই জানাইতেন। একদিন বারুইখালি বাটীর প্রতিবেশী কায়স্থ পরিবারে পুত্রবধূ ও শাশুড়ীর মধ্যে ভীষণ ঝগড়া হইতেছিল। যুবক জগদীশ মাতাকে একান্তে ডাকিয়া তাহা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "মা, বিবাহের এই ফল"। মাতা এই ইঙ্গিত বুঝিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে পুত্রের অশান্তি উৎপাদন ভয়ে তাঁহাকে কখনও বিবাহ করিতে আজ্ঞা করেন নাই। কারণ তিনি জানিতেন যে জগদীশ কখনও মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করেন না।

জগদীশের মাতা লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু তাঁহার নিকট এই প্রকাণ্ড পরিবারের ও অন্য ছয় সাতটী তহবিল থাকিত। পৃথক্ পৃথক্ সময়ে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, পৃথক্ পৃথক্ পরিমাণ টাকা, আনা, পয়সা নেওয়া দেওয়া সত্বেও কোনরূপ ভুলভ্রান্তি হইতে দেখা যায় নাই। বেলা প্রায় দুইটার সময় যখন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া তিনি পৈতার সূতা কাটা বা কাঁথা সেলাই প্রভৃতি কার্য্যে রত থাকিতেন, তখন তাঁহাকে মহাভারত, রামায়ণ বা পুরাণাদি

শুনাইতে হইত। যদি কেহ পড়িতে পড়িতে তাঁহার পূর্ব্বশ্রুত কোন স্থানের পদ ভুল করিত বা ভাষা বদলাইয়া পড়িত তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। জগদীশ মাতার ঐরূপ অসাধারণ স্মরণশক্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ভগবদনুরক্তি ব্যতীত কোন পার্থিব বিষয়ে আসক্তি না হয়, তজ্জন্য সতত সতর্ক ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার প্রিয় সেতারটীকে চিরতরে পরিত্যাগের কথা বলা যাইতে পারে।

লেখাপড়া, বৈষয়িক ও গার্হস্থ্য কাজ কর্ম্ম, সঙ্গীত বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার এরূপ জ্ঞান ছিল যাহা অতি অল্প লোকেরই থাকে। কিন্তু কখনও নিজেকে জাহির করা দূরের কথা বরং যথাসাধ্য আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন। যতদিন তাঁহার মাতা কাশীবাসিনী হ'ন নাই, তিনি কলেজ ও স্কুলের কতকগুলি ছাত্রসহ রীতিমত গ্রীষ্ম ও পূজার বন্ধে বাটী আসিতেন ও দিনগুলি নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ ও ধর্ম্মালোচনায় কাটাইয়া দিতেন। সে কয়দিন যেন গ্রামখানি নবজীবন লাভ করিত! হায়! সে দিন আর ফিরিয়া আসিবে না! প্রতিবেশীর দুঃখে সেরূপ আর কাহারও চক্ষে জল ঝরিবেনা!

---

# বন্ধু আমার

যাহাকে ৫২ বৎসর হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছি, তাহাকে বিশেষণে সুশোভিত করিবার আবশ্যক নাই। ১৮৮১ সালে জগদীশ ও আমি Metropolitan Institutionএ First Year Classএ ভর্ত্তি হই। ক্লাশে ১৫০ জন ছাত্র, নানাস্থান হইতে অসিয়াছে, সকলেই অপরিচিত। আমি মদন মিত্রের লেনে মাতুলালয়ে থাকি এবং ঐ গলিতেই এক-বাসায় জগদীশ এবং কতিপয় যশোরের ছাত্র থাকে। জগদীশের ভগ্নীপতি শীতলের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয় এবং সেই সূত্রে জগদীশের সহিত পরিচয় হয়। প্রথম পরিচয়েই বুঝিতে পারি ইনি একটি রত্নবিশেষ। চেহারা যেরূপ সুন্দর, কথাবার্ত্তা সেইরূপ মিষ্ট। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রতি এত আকৃষ্ট হইলাম যে প্রতিদিন বৈকালে তাঁহার বাসায় যাইতাম, না গিয়া থাকিতে পারিতাম না। ক্লাসে উভয়ে পাশাপাশি বসিতাম, কাহারও ব্যবধান সহ্য করিতে পারিতাম না। প্রথমে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন হইত, শীঘ্রই তাহা 'তুমি'তে আসিয়া দাঁড়ায়।

*Black's Goldsmith* আমাদের পাঠ্য পুস্তক ছিল। তাহাতে Boswell ও Dr. Johnsonএর অনেক কথা লেখা ছিল। আমার ইচ্ছা হইল আমি জগদীশের Boswell হইব। একখানি ক্ষুদ্র Diary লিখিতে আরম্ভ করিলাম। পেন্সিলে লেখা, পড়া কঠিন, লেখাও অতি ক্ষুদ্র। হঠাৎ একদিন তাহা জগদীশের সামনে পড়ে। জগদীশ তাহা কাড়িয়া লইলেন এবং সমস্ত পড়িয়া ফেরৎ দিলেন।

বহুদিন হইল সেখানি হারাইয়াছি এবং তজ্জন্য কত আক্ষেপ করিয়াছি। গত ৩১শে জানুয়ারী, যখন জগদীশের সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ, সেদিনও জগদীশ Diaryর কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন।

জগদীশের পিতামাতার পরিচয় লই নাই, কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ইন্দুর সংবাদ লই। সে কেমন ছেলে জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—কথাগুলি আমার স্মৃতিপটে জলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত আছে—"লেখাপড়ায় আমার চাইতেও খারাপ, স্বভাব চরিত্রে আমার অপেক্ষা ঢের ভাল"। আমি শুনিয়া অবাক্! যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৫৲ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইয়াছে এবং যাহাব চরিত্র দেবোপম বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, সে আপনাকে এইরূপে খাটো করিয়া বর্ণনা দ্বারা "বড় হবি ত ছোট হ" এই প্রবাদবাক্যের সত্যতা দেখাইয়া দিল। "তৃণাদপি সুনীচেন" এই মহাবাক্যের এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর দেখি নাই।

১৮৮২ সালের গ্রীষ্মাবকাশেব সময় জগদীশ ও শ্রীশদা আমার বাড়ীতে কয়েক দিন অবস্থান করেন—তাঁহাদের নূতন বাসা ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত। এ কয়দিন আমার মনে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। ২৪ ঘণ্টা জগদীশের সহিত একত্রে বাস! যেন হাতে স্বর্গ পাইয়াছিলাম।

আমার কুঞ্জবিহারী নামক এক সহোদর ছিল। সে তখন কলিকাতা নর্ম্যাল স্কুলে পড়িত। জগদীশ ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইত, তাহা হইতে এক টাকা প্রতিমাসে কুঞ্জকে জলখাবারের জন্য দিত। ২ বৎসর পরে কুঞ্জ নর্ম্যাল স্কুল হইতে পাশ করিয়া ৫৲ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইয়া Hare Schoolএ ভর্ত্তি হয় এবং ২ বৎসরে Entrance পরীক্ষা দিয়া

২০৲ টাকা বৃত্তি পায়। সুতরাং এই ৪ বৎসর কুঞ্জকে মাসিক সাহায্য করিবার আর আবশ্যক হয় নাই। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, জগদীশের মাসিক দান হেতুই কুঞ্জর ঐরূপ উন্নতি হইয়াছিল।

সেবার F.A. পরীক্ষায় অনেক ফেল হয়। সেনেট হাউসে পরীক্ষার ফল টাঙ্গাইয়া দিয়াছে। গিয়া দেখি আমাদের কলেজের Listএ অধিকাংশই ব্লু পেন্সিলে কাটা নাম। খুব নিকটে গিয়া দেখিলাম কতিপয় অখণ্ড নাম আছে এবং তাহার মধ্যে জগদীশের ও আমার নাম। তখনি পোষ্ট কার্ডে বরিশালে খবর পাঠাইলাম। জগদীশ পাশের খবর প্রথম আমার নিকট হইতেই পায়। পরে যখন গেজেটে ফল বাহির হইল এবং অশ্বিনীবাবুর হাতে পড়িল, তিনি জগদীশের উচ্চস্থান দেখিয়া "কেয়াবাৎ!" বলিয়াছিলেন। ইহা জগদীশের মুখে শুনিয়াছি।

১৮৮৩ সালের ফাল্গুন মাসে আমার বিবাহ হয়—চাতরা গ্রামে। জগদীশ ও আর কয়েকজন সহপাঠী বরযাত্রী হইয়াছিলেন। বিবাহের পর আমি মামার বাড়ী ত্যাগ করি এবং জগদীশদের বাসায় প্রবেশ করি। ২ বৎসর একসঙ্গে থাকি। ১ম বৎসর ভিন্ন ঘরে ছিলাম, কারণ জগদীশের ঘরে থাকিলে তাস, পাশা, সতরঞ্চ খেলায় ব্যাঘাত হইত। জগদীশ এসব খেলায় যোগ দিত না। আমি কিন্তু ইহাতে ডুবিয়া থাকিতাম। আমাদের বাসা ছিল Beadon Streetএ। নিকটেই Bengal Theatre এবং তৎকালীন Star Theatre। Starএ গিরীশবাবুর চৈতন্য-লীলা এবং প্রভাস-যজ্ঞ নূতন অভিনয় হয়। বাসার সকলেই অভিনয় দেখিতে যাইতেন—জগদীশ ও আমি বাদে। জগদীশ যাইতেন না on principle। আমি যাইতামনা অর্থাভাবে।

যে টাকা দর্শন এবং শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য ব্যয় করা হয়, তাহা উদর-সেবায় ব্যয় করিলে বেশী সার্থক হয়, ইহাই আমার মত বা principle.

আমাদের বাসায় এক রাঁধুনী ছিল, আকৃতি, প্রকৃতি, বর্ণ, কথাবার্ত্তা ভদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যার মত। কাহারও কোন সন্দেহ হয় নাই। হঠাৎ একদিন প্রাতে সকলেই শুনিল, সে ছুতার বংশীয়া। সেইদিন হইতেই নিরুদ্দেশ। সকলেই গালে হাত দিয়া বসিল। তখন গান্ধী-যুগ হয় নাই, আমাদের জাত গিয়াছে, কি করা যায়! ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং আমার স্বশ্রেণী। তাঁহাকে আমার মামার বাড়ীতে নীলমণিবাবুর নিকট মধ্যে মধ্যে আসিতে দেখিয়াছিলাম এবং তাঁহার নিকট পরিচিত ছিলাম। জগদীশ, আমি এবং আরও কয়জন ছাত্র তাঁহার নিকট গিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রার্থনা করি। তিনি ১০০৲ টাকার ফর্দ্দ দিলেন। আমরা অপারগ জানাইলে ৫০৲ এবং তাহাতেও অক্ষম শুনিয়া ১০৲ টাকায় নামিলেন। আমরা বলিলাম, টাকা কোথা পাইব? তখন তিনি বলিলেন—১০,০০০ বার গায়ত্রী জপ ও গঙ্গাস্নান। আমরা আঃ বলিয়া বাঁচিলাম এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আনন্দে ফিরিলাম। অতি সহজে নষ্ট-জাত পুনরুদ্ধৃত হইল, হেঁট মাথা আবার উঁচু হইল।

আর এক দিনের কথা মনে পড়িতেছে। আমাদের বাসায় ৪ জন বর্দ্ধমান জেলার ছাত্র, ২ জন হুগলী জেলার এবং ১৯ জন "বাঙ্গাল"। একজন বর্দ্ধমেনে অন্য একজন বাঙ্গালকে গরু উপলক্ষ করিয়া শ্লীলতা-বিরুদ্ধ এক কথা বলে। তখনি "বাঙ্গাল" মহলে হৈ চৈ পড়িয়া যায়। এ ঘটনার কিছু পূর্ব্বে নরিস সাহেব সুরেন্দ্রবাবুর নামে Rule issue করেন for Contempt of Court. বাঙ্গাল ভায়ারাও বর্দ্ধমান

জেলার ছাত্রের নামে Rule issue করিয়া বিচারের দিন স্থির করিয়া দেন। তেতালায় বিচার-বৈঠক বসিল। আসামী ও ফরিয়াদির জবানবন্দী হইল। সমস্ত শুনিয়া, জগদীশ একখানা কাগজে পেন্সিলে লিখিলেন—আমার বেশ স্মরণ আছে—"It is an ugly case. Each party to apologise and mutually to forgive". এই লিখিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন, উভয় পক্ষ তাঁহার রায় শিরোধার্য্য করিয়া লইল। কাহারও মনে মালিন্য রহিল না। ইহাকেই বলে পুরুষকার এবং তাহা এত অল্প বয়সেই ব্যক্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, Third Yearএ আমি ভিন্ন ঘরে ছিলাম। Fourth Yearএর প্রথমেই জগদীশ আমাকে বলিলেন, "এক বৎসর ত খেলায় কাটালে, এখন আমার ঘরে এস"। আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া তখনি তাঁহার ঘরে আসিলাম এবং পরশমণির সংসর্গে অনেক ময়লা যেন ধুইয়া ফেলিলাম। বি-এ পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হই তাহা কেবল জগদীশের সঙ্গে এক ঘরে থাকিয়া। আর এক কথা, আমাদের বাসায় যত বি-এ ছাত্র ছিল—১৫।১৬ জনের কম নয়—কেহই ফেল হয় নাই। হয় ত ইহাও জগদীশের প্রভাবে।

একদিন অশ্বিনীবাবু হঠাৎ জগদীশের ঘরে উপস্থিত। পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখি নাই, কেবল নাম শুনিয়াছিলাম। দেবদর্শন হইয়া গেল। অল্পক্ষণ দেখা, কিন্তু ৪ বৎসর পরে অশ্বিনীবাবু শ্রীরামপুর আসিলে আমাকে দেখিবামাত্র বলেন "এ যে জগদীশবাবুর তিনি"। এই এক কথায় আমার যেরূপ আনন্দে বুক ফুলিয়াছিল, তাহা কথায় বলা যায় না।

পাঠ সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই আমরা শিক্ষকতা আরম্ভ করি—জগদীশ বরিশালে এবং আমি জন্মস্থান শ্রীরামপুরে। মধ্যে মধ্যে

জগদীশ শ্রীরামপুরে আসিতেন এবং আমাদের মিলনের সুযোগ হইত। গঙ্গাস্নানের সময় আমি তাঁহার শুক্‌নো কাপড় লইয়া যাইতাম, ভিজা কাপড় লইয়া আসিতাম এবং ইহাতে শ্লাঘা বোধ করিতাম। এরূপ ভক্তি, শ্রদ্ধার ও ভালবাসার পাত্র আর পাই নাই।

একবার তাঁহাকে আমার কর্ম্মস্থলে Union Schoolএ লইয়া যাই। প্রথম শ্রেণীতে ১ ঘণ্টা পড়াইতে বলি, উদ্দেশ্য—বালকগণ তাঁহার সংসর্গে আসিয়া উপকৃত হউক, এমন সুযোগ আর হবে না। ছুটীর পর আমাকে জিজ্ঞাসা করেন "এখানে সুখে আছ ত?" আমি কহিলাম, খুব সুখে আছি এইজন্য যে রাখালবাবু আমাব দক্ষিণ হস্ত এবং অকৃত্রিম সুহৃৎ। বস্তুতঃ জগদীশ ও রাখাল এই দুই জনকে বন্ধুভাবে পাইয়া নিজের জীবনকে ধন্য বলিয়া মনে করি।

ছাত্রজীবনে জগদীশকে Politicsএ উৎসাহিত দেখি নাই। Gladstoneএর নাম আমি প্রথমে তাঁহাকে শুনাই। তিনি তখন প্রধান মন্ত্রী এবং ভারত-বন্ধু বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। Salisbury তখন Conservativeদের নেতা, তাঁহাকে ভারত-শত্রু বলিয়া জগদীশের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলাম। এ কথা আমার ১৮৮১ সালের Diaryতে লিখিয়াছিলাম। তাহার পার্শ্বে জগদীশের মন্তব্য ছিল, আমার ঠিক স্মরণ আছে—"Gladstone is our Friend, Salisbury is our Enemy: God only knows who is foe and who is friend." ইহার অর্থ—"বাহ্য দৃশ্যে ভুলনারে মন" অথবা "Things are not what they seem". কিন্তু যদিও জগদীশকে প্রকাশ্যে রাজনীতি-ক্ষেত্রে নামিতে দেখি নাই, তৎকালীন Congressএ তাঁহার খুব আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল। আমি ১৮৯২ সালে শ্রীরামপুরের প্রতিনিধি হইয়া Allahabad Congressএ যাই। এ কথা জগদীশকে

লিখিলে তিনি প্রত্যুত্তরে লিখেন, "I am really glad that Serampore is represented in the Congress and by you." আমার বোধ হয় ইহার কিছু পূর্ব্বে জগদীশ বরিশালের প্রতিনিধি হইয়া নাগপুর Congressএ গমন করেন। বৎসরের কথা ঠিক মনে নাই।

অনেক বৎসর পরে ১৯০৮ সালে হঠাৎ একদিন জগদীশ আসেন। সঙ্গে ভাগিনেয় ছিল। বোধ হয় অশ্বিনীবাবুকে ধানবাদে দেখিতে যাইতেছেন। আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। আমার পিতৃদেব তখন অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় যাইতে পারিলাম না। ফিরিবার সময় জগদীশ আবার দেখা করিতে আসিলেন। সেইদিন আমার পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজন। জগদীশকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। এরূপ যোগাযোগ আশা করি নাই এবং বুঝিলাম আমার ক্রিয়া সফল এবং জীবন সার্থক।

তারপর অনেক বৎসর গত হয়, আর দেখা হয় না। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পত্র লেখালেখি হইত। গত ২১শে ডিসেম্বর ১৯৩১ সালে বেলগেছিয়া পান্নালাল বিদ্যামন্দিরের একজন শিক্ষক কার্য্যোপলক্ষে আমার বাটীতে অসেন। কথায় কথায় জানিলাম তিনি জগদীশের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র এবং তাঁহার নিকট শুনিলাম জগদীশ স্বাস্থ্যের জন্য মধুপুরে গিয়াছেন এবং মধুপুরের নবীন-আরামে অবস্থান করিতেছেন। তখনি জগদীশকে পত্র লিখিলাম, এ সংবাদ আমাকে তিনি পূর্ব্বে দেন নাই কেন? সে জন্য আমি দুঃখিত। উত্তর আসিল, তিনি শীঘ্রই কলিকাতা ফিরিবেন এবং বালীগঞ্জে শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদারের বাটীতে কিছুকাল অবস্থান করিবেন এবং আমাকে তথায় দেখা করিতে বলিলেন। অল্পদিন পরেই তিনি

কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন এবং আমাকে সে সংবাদ দেন। আমি আজ যাব, কাল যাব এইরূপ মনে করিতেছি, ইতিমধ্যে একদিন গত ৩১শে জানুয়ারী প্রাতে জগদীশ, হরিদাসবাবু, পূর্ব্বোক্ত শিক্ষক অনন্তবাবু এবং আর কয়েকজন এ অধমের বাটীতে মোটর-যানে উপস্থিত। আমি আহ্লাদে কাঁদিয়া ফেলিলাম এবং জগদীশকে জড়াইয়া ধরিলাম। হরিদাসবাবু একটু পরে চলিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন বৈকালে আসিবেন। জগদীশ আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করেন এবং আমি ক্ষণেককাল তাঁহার পদসেবা করি। বলিলাম, আমি এ পর্য্যন্ত মন্ত্র লই নাই। গৃহিণী এ জন্য অনেকবার আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে প্রতিবার বলিয়াছি, যদি মন্ত্র লইতে হয়, জগদীশের নিকট লইব। জগদীশকে বলিলাম, আমাকে মন্ত্র দাও। তাহাতে জগদীশ বলিলেন, "আমি কাহাকেও মন্ত্র দিই নাই, তুমি গায়ত্রী জপ কর, তাহাতেই মন্ত্রের কায হবে।" ইন্দুর কথা জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম সে বহুপূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। শীতলবাবু পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহাও শুনিলাম। বৈকালে হরিদাসবাবু আসিয়া বলিলেন আমাদের দুজনার একত্রে ফটো লইবেন। তখনি Photographer ডাকা হইল এবং জগদীশ ও আমার একত্রে ছবি তোলা হইল। সেই ছবি প্রত্যহ দেখিতেছি, যেন একটী দেবমূর্ত্তি আমার ঘরে বিরাজমান। যতক্ষণ আমরা একত্রে ছিলাম, অতীতের আলোচনা ও পুরাতন বন্ধু ও সমপাঠীদের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। আমার পুত্রকন্যা, পুত্রবধূ, গৃহিণী সকলে তাঁহার পদধূলি লইয়া আশীর্ব্বাদ পাইল। আমি তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হইলাম, বড়দিনের সময় বরিশালে গিয়া তাঁহার আশ্রমে ১ সপ্তাহ থাকিব। এ কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন,
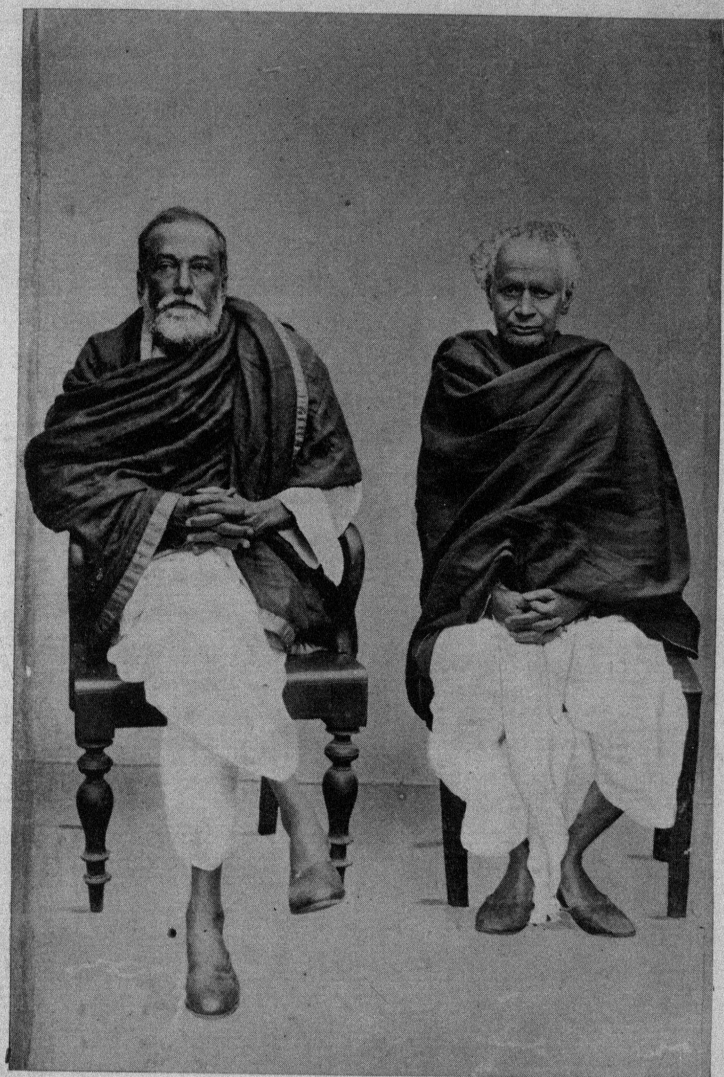
দুই বন্ধু
আচার্য্যদেব ও শ্রীহরিমোহন গোস্বামী

"তুমি বালীগঞ্জে যাইতে পারিলে না, বরিশালে যাইবে ?" তখন কি ভাবিয়াছিলাম এই আমাদের শেষ দেখা !

১০ই নভেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁহার পরলোকগমন ঘোষিত হয়। পরে জানিলাম ঐ দিনই তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করেন। কাগজে এ সংবাদ এত শীঘ্র কিরূপে ছাপা হইল, আজিও বুঝিতে পারি নাই। তিনি ত মায়া কাটাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমার বুকের তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার মতন লোক আর দেখিলাম না। এক কথায়, তিনি অজাতশত্রু, ন্যায়-নিষ্ঠ, সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। কলিতে যুধিষ্ঠিরের এবং ভীষ্মের একাধারে অবিস্থিতি তাঁহাতেই হইয়াছিল।

# শিক্ষা-ব্রতে

বরিশালে দুইজন সর্ব্বজনপূজিত মহাপুরুষ ছিলেন। একজন অশ্বিনীকুমার দত্ত, অপর জন জগদীশ মুখোপাধ্যায়। ভক্তিভাজন অশ্বিনী বাবু নয় বৎসর পূর্ব্বে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বহু বিস্তৃত ছিল, নানাদিকে তিনি কাজ করিতেন। তাঁহার নাম ও খ্যাতি কেবল ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে নয়, সাগর পারে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও পৌছিয়াছিল। ভক্তিভাজন জগদীশ বাবুর কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ, বরিশাল সহরেই একরূপ আবদ্ধ ছিল। তিনি শিক্ষক ছিলেন এবং আদর্শ শিক্ষকরূপে সহস্র সহস্র বালক, বৃদ্ধ, যুবকের ভক্তি-অর্ঘ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহাদের হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। আমার সৌভাগ্য, তাই জীবনের উষাকাল হইতে উভয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত ছিলাম, উভয়ের চরণতলে বসিয়া জীবনের শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আর দুঃখ এই যে, তাঁহাদের মত ঋষিকল্প পুরুষের নিকট সাক্ষাৎ ভাবে জীবনের অনুপ্রাণনা পাইয়াও জীবনকে সেরূপ উন্নত করিতে পারি নাই। আজ এই বৃদ্ধ বয়সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া, রোগ-শয্যায় শায়িত থাকিয়া, এক একটি করিয়া জীবনের অপরাধ ও প্রত্যবায়ের কথা মনে করিতেছি এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে অনুতপ্ত হৃদয়ে ভগবানের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। বরিশালের স্তম্ভ-স্বরূপ, বরিশালের গৌরব—অশ্বিনীকুমার ও জগদীশ উভয়েই আজ সকলকে কাঁদাইয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। বরিশাল আজ শোকাচ্ছন্ন; ভগবানের বিচিত্র লীলা!

অশ্বিনীকুমারের বাড়ী বরিশালেই ছিল, বাটাজোড়ে। ভক্তিভাজন জগদীশ বাবুর বাড়ী খুলনা জিলার অন্তঃপাতী বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত বারুইখালি গ্রামে। কিন্তু বরিশালে বাড়ী না হইলেও চিরকুমার থাকিয়া জগদীশ বাবু বরিশালকেই কর্ম্মক্ষেত্র করিয়াছিলেন এবং বরিশালই তাঁর বাড়ী ঘর ছিল। তিনি চিরকুমার, পুত্র কন্যা তাঁহার নাই। কিন্তু শত সহস্র পুত্র কন্যা তাঁহার নিকট শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়া তাঁহার জন্য শোক-অশ্রুপাত করিতেছে।

সে ১৮৮৫ সালের কথা। জগদীশ বাবু কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষা দিয়াছেন। গেজেট আসিল, অশ্বিনী বাবু গেজেটে জগদীশ বাবুর নাম খুঁজিতে লাগিলেন। সেই বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়ম অনুসারে পরীক্ষা হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে বি, এ, অনার্স ছিল না। এম, এ, তে অনার্স ছিল। অশ্বিনী বাবু পাশ লিষ্টিতে এক জগদীশ মুখোপাধ্যায় নাম দেখিলেন। তাহাতে গুণানুসারে নাম দেওয়া নাই, বর্ণমালা অনুসারে। অশ্বিনী বাবু প্রথমে খুব দুঃখিত হইলেন। তারপর অনার্স লিষ্টিতে সংস্কৃতের মধ্যে জগদীশ মুখোপাধ্যায় নাম দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—This must be our Jagadis—এই আমাদের জগদীশ। বাস্তবিকও তাহাই হইল। জগদীশ বাবু সংস্কৃতে অনার্স প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অশ্বিনী বাবুর ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ছিলেন। অশ্বিনী বাবু তাহাকে খুব স্নেহ করিতেন। ১৮৮৪ সনের ২৭শে জুন শুক্রবার বেলা দুই ঘটিকার সময় হরিঘোষের টিনের ঘরে (লোকে বলিত হরি ঘোষের গোয়াল ঘর) ব্রজমোহন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তখন স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ হেড মাষ্টার ছিলেন; তৎপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য কয়েক মাস হেড মাষ্টার হইয়াছিলেন। আমি স্কুল প্রতিষ্ঠার

দিনই গভর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে আসিয়া ব্রজমোহন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই। এই সময় স্কুলের দুইজন শিক্ষক চলিয়া যান। অশ্বিনী বাবুর মধ্যম ভ্রাতা কামিনী বাবু ভাল ইংরেজী পড়াইতেন, তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করেন। আর স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা যান। স্কুলে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষকের অভাব হইল। জগদীশ বাবু ভাল পাশ করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে এম, এ, পাশ করিয়া উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আর্থিক উন্নতি করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার অন্যরূপ উচ্চ আদর্শ ছিল। অশ্বিনী বাবুর সস্নেহ আহ্বানে তিনি ১৮৮৫ সালে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হইয়া আসেন এবং আজীবন বরিশালেই অবস্থান করেন। পরে তিনি হেডমাষ্টার হইয়াছিলেন এবং কিছুদিন কলেজে তর্কশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রও পড়াইয়াছিলেন। বরিশালে কলেজে পড়িবার আমার সুযোগ হয় নাই। ঐ স্থানে কলেজ বসিবার পূর্ব্বে আমি ১৮৮৮ সালে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতায় আসি। জগদীশবাবু যখন বরিশালে আসিলেন, তখন আমি বাড়ীতে ছিলাম। বরিশালে তখন খুব কলেরার প্রকোপ। সেই জন্য বাবা আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে বাড়ী পাঠাইলেন। বাড়ী বসিয়াই জগদীশ বাবুর কথা শুনিলাম। বরিশাল আসিয়াই স্কুলে যাইয়া তাঁহাকে দেখিলাম, অতি সাদাসিদে লোক, পোষাকের পারিপাট্য নাই, ধুতি চাদর পরিয়া অনেক সময়ে স্কুলে আসিতেন। মধ্যে মধ্যে প্যাণ্টালুন পরিতেন, হয়ত কাল প্যাণ্ট তার উপর সাদা চাপকান, অদ্ভুত দেখাইত। মধ্যে মধ্যে একটী কাল চোগাও থাকিত। তিনি আমাদের তৃতীয় শ্রেণীতে ইতিহাস পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই তাঁহার অধ্যাপনাতে একটু নূতনত্ব
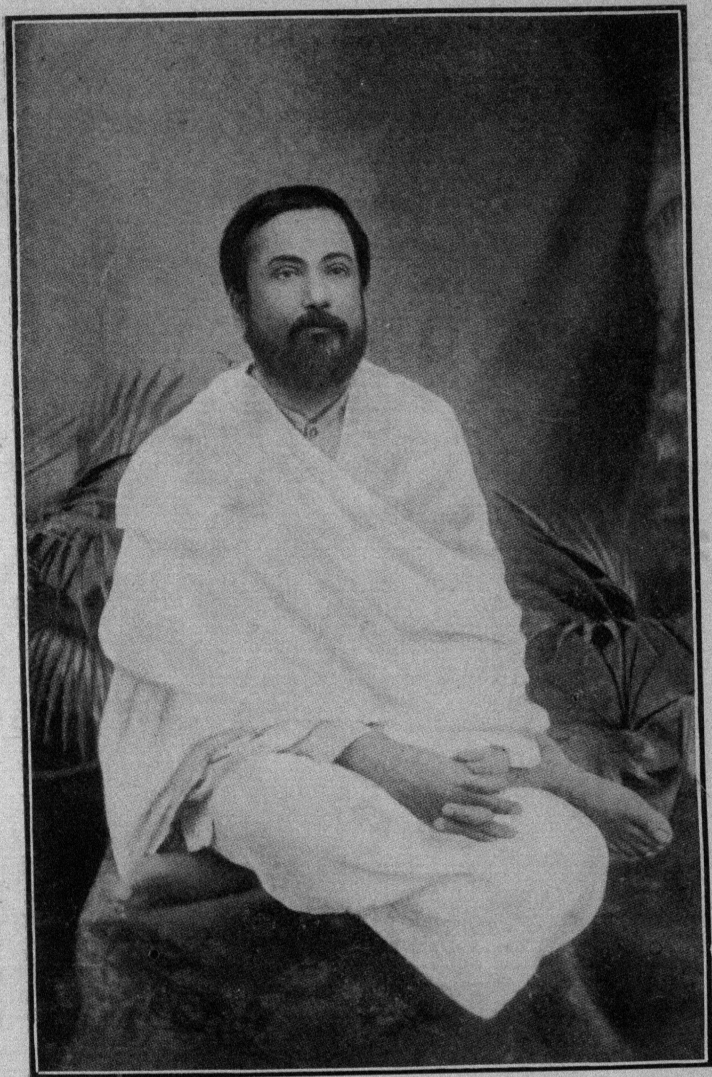
*Jagadis Mukerji*

দেখিলাম। এ পর্য্যন্ত জানিতাম শিক্ষকগণ পরবর্ত্তী দিনের পড়া নির্দ্দেশ করিয়া দেন, আর তদ্দিনের পাঠ জিজ্ঞাসা করেন মাত্র, তাহাতে আমাদের খুব অসুবিধা হইত। আমাদের ত গৃহ শিক্ষক থাকিত না, পড়া বুঝাইয়া দিতে পারে এমন ইংরেজী জানা লোকও সব সময়ে কাছে পাইতাম না। জগদীশ বাবু পরবর্ত্তী দিনের জন্য যে পাঠ নির্দ্দেশ করিতেন, তাহা বুঝাইয়া দিতেন, ইহাতে আমাদের সুবিধা হইল। কামিনী বাবু আমাদের ইংরেজী সাহিত্য পড়াইতেন; তিনি শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিলে জগদীশ বাবুই ইংরেজী পড়াইতে আরম্ভ করেন। পরে স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, হেড মাষ্টার হইয়া আসিলেন। তখনও জগদীশ বাবুই আমাদের ইংরেজী সাহিত্য পড়াইতেন, আর কালীপ্রসন্ন বাবু গণিত পড়াইতেন। এ পর্য্যন্ত স্বয়ং অশ্বিনীবাবু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজী সাহিত্য পড়াইতেন। স্বর্গীয় ত্রিগুণাচরণ সেনের হেডমাষ্টার হইয়া আসার কথা ছিল। নানা কারণে তাঁহার আসা সম্ভব হইল না। ত্রৈলোক্য বাবুও মাত্র এক বৎসর থাকিয়া চলিয়া গেলেন। কালীপ্রসন্নবাবু ইতিহাস ও গণিত প্রথম শ্রেণীতে পড়াইতেন। অশ্বিনী বাবুর কর্ম্মক্ষেত্র বহুবিস্তৃত। তাঁহাকে অধ্যাপনা লইয়া সর্ব্বক্ষণ আবদ্ধ থাকিতে হয়। ইহাতে কাজ কর্ম্মের ক্ষতি হয়। প্রশ্ন উঠিল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজী সাহিত্য কে পড়াইবেন? দৃষ্টি পড়িল জগদীশ বাবুর উপর। তিনি বি, এ, পাশ, সংস্কৃতে অনার্স। তৎকালে অনেকে অশ্বিনী বাবুকে বরিশাল ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রশস্ততর ক্ষেত্রে দেশসেবা করিবার জন্য যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অশ্বিনী বাবু জগদীশ বাবুকে বলিলেন, আমার কলিকাতা যাওয়া উচিত কিনা তৎসম্বন্ধে পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি পরামর্শ দিয়া

তুমি ইংরেজীতে আমাকে একখানা চিঠি লিখ। জগদীশ বাবু চিঠি দিলেন, তিনি বরিশাল ত্যাগের বিরুদ্ধে লিখিলেন। অশ্বিনী বাবুর বরিশাল ত্যাগের মত হইল না। আর এই সুযোগে তিনি জগদীশ বাবুর ইংরেজী লেখা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সমর্থ হইলেন এবং তাঁহাকেই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজী পড়াইবার উপযুক্ত লোক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। সুতরাং আমরা যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে ও পরে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম, জগদীশ বাবুও ঐ দুই শ্রেণীতে ইংরেজী পড়াইবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। স্কুলের মধ্যে আমাদের শ্রেণীর উপরেই কর্ত্তৃপক্ষগণের খুব আশা ছিল। উচ্চ কয়েক শ্রেণীর মধ্যে আমাদের শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা বেশী ছিল ও ভাল ছাত্র ছিল। আমরা স্কুলটিকে খুব ভালবাসিতাম এবং কর্ত্তৃপক্ষের নিকট খুব আবদার করিতাম, তাঁহারাও আমাদের আবদার রক্ষা করিতেন। কোন ছাত্র এই স্কুল ত্যাগ করিতে চাহিলে আমরা তাহাকে স্কুল ত্যাগ না করিবার জন্য অনুরোধ করিতাম। একবার অশ্বিনী বাবু বরিশালে নাই, ত্রৈলোক্য বাবু প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজী পড়াইতেছেন। কয়েকটি ছাত্র তাঁর অধ্যাপনাতে সন্তুষ্ট না হইয়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলে যাইতে ইচ্ছা করিল। আমরা বলিলাম, অশ্বিনী বাবু ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। অনেকে আমাদের কথা শুনিলেন। অশ্বিনী বাবু আসিলেন। ত্রৈলোক্যবাবুর ইংরেজী জ্ঞানে ও অধ্যাপনাতে তিনি সন্তুষ্টই ছিলেন; তবুও তিনি আবার গদ্য সাহিত্য পড়াইবার ভার গ্রহণ করিলেন। আমরা স্কুলের গৌরব রক্ষা করার জন্য খুব চেষ্টা করিতাম। আমাদের নৈতিক চেষ্টা দেখিয়া লোকে ঠাট্টা করিয়া বলিত 'ব্রজমোহনী মোরালিটি'। আমরা যাত্রা শুনিতে, থিয়েটার

দেখিতে যাইতামনা। তাস প্রভৃতি অলস ক্রীড়া পছন্দ করিতাম না।

উৎসব উপলক্ষে স্কুলগৃহ আলোকমালায় সুসজ্জিত না করিয়া গরীবদের পয়সা ও বস্ত্র দান করিতাম। ইহাই বিদ্রূপের প্রধান কারণ ছিল। আমাদের উপর কর্ত্তৃপক্ষের যে আশা ছিল তাহা পূর্ণ করিতে আমরা সক্ষম হইয়াছিলাম। আমরা এ পর্য্যন্ত পরীক্ষায় পাশের সংখ্যায় গভর্ণমেণ্ট স্কুলকে পরাজিত করিতে পারি নাই, কারণ সংখ্যায় আমরা অল্প ছিলাম। কিন্তু ছাত্রবৃত্তিতে আমরা গভর্ণমেণ্ট স্কুলকে পরাজিত করিলাম। আমাদের স্কুল হইতে একজন ১৫৲ টাকার ও দুইজন ১০৲ টাকার বৃত্তি পাইল। গভর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে মাত্র একজন ১০৲ টাকার বৃত্তি পাইল। পরবর্ত্তীকালে ব্রজমোহন স্কুল হইতে অনেকে ২০৲ টাকার বৃত্তি পাইয়াছে। এবং একজন একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। ব্রজমোহন স্কুলের প্রতি রোষবশতঃ গভর্ণমেণ্ট সে ছাত্রকে বৃত্তি দিলেন না। তবুও সে ব্রজমোহন কলেজেই আই, এ, পাঠ করিল ও প্রথম স্থান অধিকার করিল। সে বৎসরও গভর্ণমেণ্ট তাহাকে বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিলেন। আরও অনেক ছাত্র ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ হইতে পাস করার অপরাধে বৃত্তিও পায় নাই, চাকুরীও পায় নাই।

জগদীশ বাবু আমাদের পড়াইতেন, আমার সঙ্গে বিশেষ আলাপ হইল না। কোনও শিক্ষকের সঙ্গেই কোনও একটা পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বে আমার আলাপ হইত না। এক দিন স্কুলে আসিয়াই কি কারণে যেন অশ্বিনীবাবুর ঘরে গিয়াছি, তখন পাকা বাড়ী হয় নাই; খড়ের আটচালা ঘর, সেখানে একখানা তক্তপোষের উপর

জগদীশ বাবু একখানা পুস্তক হস্তে বসিয়া আছেন। তখন বোধ হয় তিনি অশ্বিনীবাবুর বাড়ীতে থাকিতেন। পুস্তকখানা পরে জানিলাম লেথব্রিজের ইজি সিলেক্‌সন্‌স্‌। ঐ পুস্তকের কতকটা পূর্ব্বে আমরা পড়িয়াছি। তিনি আমাকে ডাকিয়া দুইটি সূত্রের অর্থ করিতে দিলেন।

From the most minute and mean
A virtuous mind can moral glean.

ছত্র দুটি কবি গ্রে লিখিত কোনও কবিতাতে ছিল। আমি উহার ব্যাখ্যা করিলাম। তদবধি তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হইল, তিনি আমাকে খুব স্নেহ করিতে লাগিলেন।

এক সময়ে আমরা একটী পুষ্করিণীর তীরে বাস করিতাম। একই ঘাটে স্নান করিতাম। তাঁহার সঙ্গে স্বর্গীয় পণ্ডিত কামিনী-কান্ত বিদ্যারত্ন, স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও পরলোকগত গোপালচন্দ্র রায় থাকিতেন। জগদীশ বাবুর এক ভাই ছিল, তার নাম ইন্দু। সেও সেখানে থাকিত, অনেক দিন হইল সে পরলোকে গিয়াছে। জগদীশ বাবু একদিন রাত্রিতে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। আমি রান্না হইবার একটু পূর্ব্বেই গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে লইয়া পুষ্করিণীর তীরে আসিলেন। নানা কথা বলিতে লাগিলেন। অবশেষে আমার হাত দু'খানি ধরিয়া বলিলেন, "ললিত, এই হাত দু'খানি যেন চিরদিন ঈশ্বরের দিকে থাকে।" তদবধি আমার নূতন অনুপ্রাণনা আসিল। আমার মন গাম্ভীর্য্যের ভাব ধারণ করিল। ধর্ম্মলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিল।

তারপর জগদীশ বাবু আমাকে স্নেহ করিতেন, আমিও আমার সকল গুপ্ত কথা, পাপের কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিতাম। তিনি

সহানুভূতির সহিত সকল শুনিতেন ও উপদেশ দিতেন। কত রাত্রি তাঁহারই সঙ্গে এক বিছানায় তাঁহারই স্নেহ আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হইয়া কাটাইয়াছি। অপর দিকে সময় সময় রাগ করিতেও ছাড়িতেন না! প্রথম শ্রেণীতে তিনি Rowe's Hints পড়াইতেন। তাহাতে ক্রিয়ার সহিত বিভিন্ন উপসর্গ যোগে যে বিভিন্ন অর্থ হয় তাহা আমাদিগকে শিখিতে হইত ও তাহার দৃষ্টান্ত দিতে হইত। ইহা ওয়েবষ্টার ডিক্সনারী ব্যতীত অন্য কিছুতে পাওয়া যাইত না। কাজেই আমি এবং অন্য অনেকে উহা শিখিতে পারিতামনা। তজ্জন্য ক্লাসে কত তিরস্কার করিতেন। একদিন বলিলেন, তুমি কথা বলিও না। আমি খুব কষ্ট পাইলাম। একদিন সন্ধ্যার পর অশ্বিনী বাবুর কাছে বসিয়া কি বিষয় আলোচনা করিতেছি, তখন হঠাৎ জগদীশ বাবু সেখানে আসিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, ললিত বুঝি রোজ এইরূপ গল্প করিতে এখানে আসে? অশ্বিনী বাবু বলিলেন, ললিত ত এখানে বেশী আসে না। বাস্তবিক আমি তাঁর নিকট বেশী যাইতাম না। আমি চিরদিনই একটু উচ্চৈঃস্বরে কথা বলি। একদিন এক বাসায় গিয়া ছেলেদের সঙ্গে কথা বলিতেছি, জগদীশ বাবু সেই বাসার অপর পার্শ্বে আসিয়াছেন, আমার কথা শুনিতে পাইয়াছেন। অমনি বলিয়া উঠিলেন 'ঐ বুঝি 'গপ্পে' এখানে এসেছে?'

আমি দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে যখন পড়ি তখন ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত ছাত্রসমাজের সভাতে প্রতি রবিবার সকালবেলা যাইতাম। কীর্ত্তনে খুব মাতিয়া উঠিতাম। এবং সময় সময় দশায় পড়িতাম। ইহা দেখিয়া আমার শিক্ষকগণ আমার মাথা খারাপ হইয়াছে মনে করিলেন এবং আমি ভাল পাশ করিয়া

স্কুলের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিব এ আশা পরিত্যাগ করিলেন। একদিন আমি কালীপ্রসন্ন বাবুর বাসায় যাইয়া তার ভাইদের সঙ্গে কথা বলিতেছি, কালীপ্রসন্ন বাবু তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বেই আমাদের একটি জ্যামিতির পরীক্ষা হইয়াছিল। তিনি আস্তে আস্তে কাগজখানা দেখিলেন, আমাকে ৫০এর মধ্যে ৪৭ দিলেন। তারপর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, ভাবিয়াছিলাম তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে, এখন তোমার কাগজ পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম তাহা নহে। তবে এখন কীর্ত্তনে অত মাতামাতি না করিয়া ভালরূপ পড়াশুনা কর। দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে যে বার্ষিক পরীক্ষা হইল, তাহাতে প্রত্যেক বিষয়েই বেশী মার্ক পাইয়া আমি প্রথম হইলাম। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে জগদীশ বাবু ডাকিয়া বলিলেন, পরীক্ষায় ভালই করিয়াছ। কিন্তু এখন একটু স্থির হইয়া পড়াশুনা কর। জগদীশ বাবু যেমন খুব স্নেহ করিতেন, তেমন প্রয়োজন হইলে ভৎর্সনাও করিতেন।

অশ্বিনী বাবু, জগদীশ বাবু, ইঁহারা ছাত্রদের কেবল পড়াশুনা দেখিতেন তাহা নহে, ছেলেদের চরিত্র সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করিতেন। আমাদের যাত্রা থিয়েটারে যাইতে নিষেধ করিতেন। টেরি কাটিতে, তাস খেলিতে বারণ করিতেন। সময় সময় অন্য ছাত্রগণকে সৎপথে আনিবার উপদেশ দিতে আমাদিগকেও পাঠাইতেন। এক দিন নীচের শ্রেণীর একটী ছাত্র বিপথে যাইতেছে শুনিতে পাইলেন। তার সঙ্গে কথা বলিবার জন্য আমাকে পাঠাইলেন। আমি তার বাড়ীতে গেলাম। তার পিতা আমাকে সন্দেহ করিয়া প্রথমে ছেলের সঙ্গে দেখা করিতে দিতে সম্মত হইলেন না। পরে যখন শুনিলেন, তাহাকে সুপথে আনিবার পরামর্শ দিতে জগদীশ বাবু আমাকে

পাঠাইয়াছেন তখন ছেলেকে ডাকাইলেন। তার সঙ্গে আমার অনেক কথা হইল। পরবর্ত্তী কালে ছেলেটী কি ভাবে চলিল তাহা বলিতে পারি না।

তৎকালে ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে লোকে ব্রাহ্মস্কুল বলিত। অশ্বিনী বাবুও ব্রাহ্ম বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। ঐ স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষক ও অনেক ছাত্রও ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা ও বক্তৃতাতে যাইতেন। তখন স্বর্গীয় কালীকুমার বসু কালেক্টরীর হেড ক্লার্ক হইয়া বরিশাল আসেন। তিনি পুত্রগণ সহ খোল করতাল একতারা বাজাইয়া বাসায় বাসায় উষা কীর্ত্তন করিতেন। প্রায়ই জগদীশ বাবুকে ঐ উষাকীর্ত্তনের দলে দেখিতে পাইতাম। কালীকুমার বাবু বরিশালে একটী 'নববিধান সমাজ' প্রতিষ্ঠিত করেন। জগদীশ বাবু এই নব প্রতিষ্টিত নববিধান সমাজের অন্যতম আচার্য্য ছিলেন।

আমি ১৮৮৮ সালে ব্রজমোহন স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াই কলিকাতা পড়িতে আসি। তখনও ব্রজমোহন কলেজ হয় নাই। কাজেই কলেজে পড়িয়া অশ্বিনী বাবু ও জগদীশ বাবুর নিকটে দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার সুযোগ আমার ঘটে নাই। তবে যখনই আমার কর্ম্মস্থল নলধা ও কলিকাতা হইতে বাড়ী যাইতাম, তখনই অশ্বিনী বাবু ও জগদীশ বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া প্রণাম করিতাম ও তাঁহাদের চরণতলে বসিয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করিতাম।

যখন বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন খুব প্রবল, তখন 'সন্ধ্যা'* নামে একটি পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। তখন রাজনৈতিক জগতে দুই দল ছিল—নরম পন্থী ও চরম পন্থী। রাজনৈতিক কারণেই আমাকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয় বটে, কিন্তু আমি তখন নরম পন্থী দলে ছিলাম। 'সন্ধ্যা' কাগজ চরমপন্থী ছিল।

ঐ কাগজে নানারূপ ব্যঙ্গচ্ছলে একদিকে গভর্ণমেণ্টকে, অপর দিকে নরমপন্থীদিগকে উপহাস করা হইত। আমি ঐ কাগজের সুর ও লেখার ভঙ্গী পছন্দ করিতাম না এবং ঐ কাগজ পাঠ করিতাম না। এক দিন বরিশালে ব্রজমোহন স্কুলের হলে বসিয়া আছি। অশ্বিনীবাবু, জগদীশ বাবু ও অন্যান্য অনেকে সেখানে আছেন। এই সময়ে 'সন্ধ্যা' কাগজ আসিল। অশ্বিনী বাবু উচ্চৈঃস্বরে 'সন্ধ্যা' পড়িতে লাগিলেন। তিনি ও অনেকে উহা শুনিয়া খুব উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছি। অশ্বিনী বাবু বলিলেন 'ললিত যে গম্ভীর হয়ে আছ, হাস্‌ছ না?' আমি বলিলাম 'আপনাদেরই উপদেশে অনেক কাল হইতে Vulgar paper (অশিষ্ট কাগজ) পড়া পরিত্যাগ করিয়াছি।' জগদীশ বাবু বলিলেন 'Lalit is right'—'ললিত ঠিক বলিয়াছে।'

জগদীশ বাবু, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজের অনুরক্ত ছিলেন। কবে কি প্রকারে তিনি অন্য ভাবাপন্ন হইলেন তাহা আমি জানি না। তবে আমি যখন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে চাই, তখন অশ্বিনী বাবু আমাকে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং অনেক বুঝাইয়াছিলেন। জগদীশ বাবুরও আমার ব্রাহ্ম হওয়ায় মত ছিল না। তবে তিনি কি কথা বলিতে আমাকে ডাকিয়াছিলেন। আমি তাঁর নিকটে গেলাম। তিনি বলিলেন, আর বলিবার প্রয়োজন নাই, You have gone too far—তুমি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছ। আমি যে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম তাহাতে অশ্বিনী বাবু ও জগদীশ বাবু উভয়েরই অমত ছিল বটে, কিন্তু আমার উপর তাহাদের স্নেহ একটুও হ্রাস হয় নাই। তাঁহারা অতিশয় স্নেহ ও আদরের সহিত আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন।

জগদীশ বাবু শেষে তাঁহার বরিশালস্থ বাসভবনেই দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। সেখানে প্রতি রবিবার সকাল বেলা অনেকে আসিতেন। তাঁহার শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই মোহিত ও উপকৃত হইতেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিবার সুযোগ আমার কখনও হয় নাই। অশ্বিনী বাবু অনেক সময়ে ব্রাহ্মসমাজে শাস্ত্রপাঠ ও নানা দৃষ্টান্ত ও সদর্থবোধক অন্য শাস্ত্রের বাক্য উচ্চারণ করিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ ও উপকৃত হইয়াছি। স্বর্গীয় ভক্তিভাজন শিবনাথ শাস্ত্রীও ঐ প্রণালীতে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। একটা শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেই হয়ত এক ঘণ্টা কাটিত। আমিও আমার ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা ঐ প্রণালীতে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিতাম।

জগদীশ বাবু রাজনৈতিক আন্দোলনে সাক্ষাৎভাবে যোগ দিতেন না। কিন্তু তিনি যে খুব স্বদেশভক্ত জাতীয়তাবাদী ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি।

সমাজ সংস্কারেও তিনি খুব অগ্রসর ছিলেন। আমি যখন নলধাতে হেড্‌মাষ্টারের কার্য্য করি তখন আমার কলিকাতার বন্ধু-গণ 'সমাজ সংস্কার সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করিয়া আমাকে তাহার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। সেই সমিতি হইতে অনেক লোককে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করান হইয়াছিল। সেই সমিতির উদ্যোগে কলিকাতায় ব্রাহ্মমতে এক বিধবা বিবাহ হয়। সমিতি হইতেই কন্যা পক্ষের ব্যয়ভার বহন করা হয়। অবশ্য বরকে পণ দেওয়া হয় নাই। সমিতি বরপণ তিরোহিত করিবার চেষ্টা করেন। সেই সমিতি হইতে আমার লিখিত 'বিবাহে পণ গ্রহণ'

নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। স্নেহলতার অগ্নি সংযোগে মৃত্যু সময়ে যখন দেশে বরপণের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন সেই পুস্তিকার বিক্রয়াবশিষ্ট খণ্ডগুলি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। সেই সমিতি হইতে বরিশালের একটি বাল-বিধবার পুনর্বিবাহের চেষ্টা করা হয়। তখন জগদীশ বাবু বলিয়াছিলেন, 'প্রয়োজন হইলে আমি এই বিবাহে পুরোহিতের কার্য্য করিব।' কিন্তু বিবাহের বন্দোবস্ত করিতে পারা গেল না।

জগদীশবাবু অস্পৃশ্যতা নিবারণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মুসলমান সকলেই সমান আদর প্রাপ্ত হইত। শুনিয়াছি তিনি বলিয়া গিয়াছেন, 'আমার মৃত্যু হইলে আমার দেহ যেন সকল বর্ণের ও সকল জাতির লোকে স্পর্শ করিতে পারে।' তাঁহার মৃত্যুর পর দুইটী মুসলমান ছাত্র নাকি তাঁহার পা ধরিয়া ক্রন্দন করিয়াছিল।

আমি নলধা হইতে একবার পূজার বন্ধে বরিশাল আসিবার পথে বাগেরহাট ষ্টীমার হইতে নামিয়া পদব্রজে তাঁহার গ্রামে যাই। তিনি আমাকে পাইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও খুব স্নেহের সহিত আমাকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তৎকালে তিনি আমার সঙ্গে একস্থানে বসিয়া আহার করিলেন না। আমার আহারের সময় কাছে বসিয়া খাওয়াইতেন, পরে অন্যত্র যাইয়া আহার করিতেন। কিন্তু এই ভাব তাঁহার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। একবার বরিশালে তাঁহার বাসাতে আমাকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। আমি যাইয়া দেখি রান্নাঘরের বারান্দায় দুইখানা পাতা রহিয়াছে। একখানাতে তিনি বসিলেন, অপরখানাতে আমাকে বসাইলেন। আমি একটু অবাক্ হইলাম কিন্তু কিছু বলিলাম না।
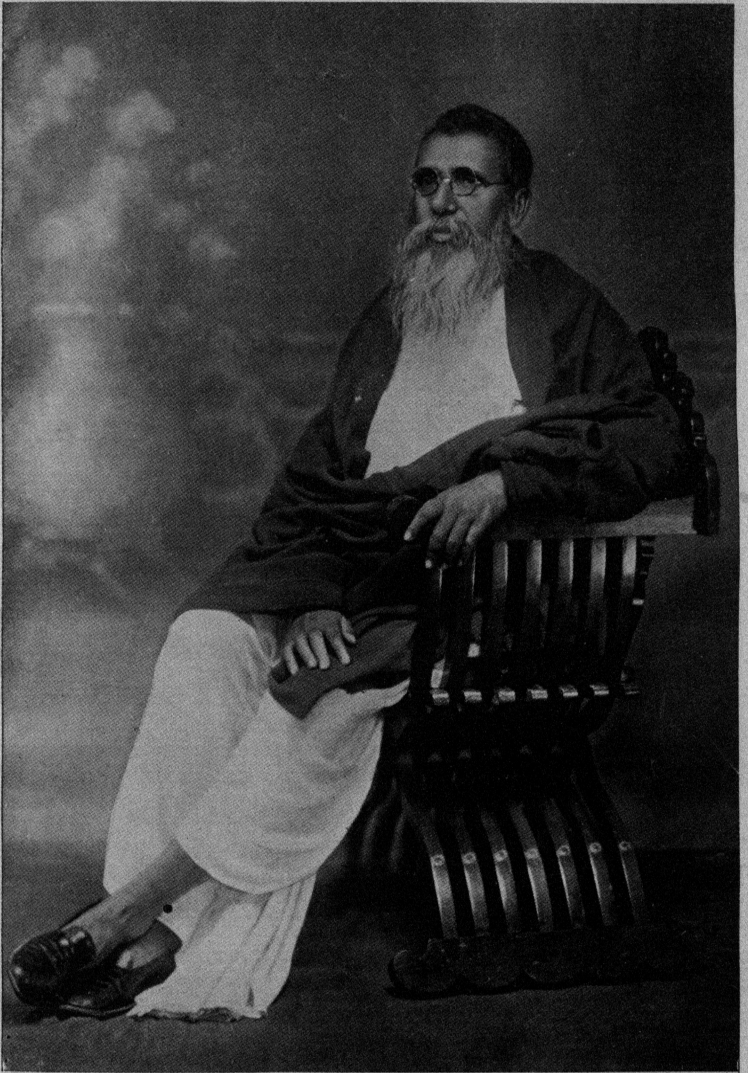
৺ললিতমোহন দাস

আহারের পর অযাচিতভাবে তিনি বলিলেন, 'দেখ ললিত, যাহা-দিগকে ভালবাসা যায়, তাদের সঙ্গে একস্থানে বসিয়া আহার করিতে দোষ নাই।' অশ্বিনী বাবুও প্রথমে ব্রাহ্মদের সঙ্গে অন্ন গ্রহণ করিতেন না। অথচ তখন সকলেই তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিত। তিনি ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত মত উপাসনাতে যাইতেন, বক্তৃতা করিতেন, ব্রাহ্মসমাজ কমিটির মেম্বর ছিলেন। কিন্তু বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতেন না। পরবর্ত্তীকালে এই আহারের নিয়ম রক্ষা করেন নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, যারা কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকে তারা অত অন্ন বিচার করিয়া চলিতে পারে না।

জগদীশ বাবু ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি উচ্চ পদ লাভ করিতে পারিতেন, অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। সে দিকে তাঁহার মন আকৃষ্ট হয় নাই। নিজে বিবাহ না করিয়া সামান্য আহার পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট থাকিয়া লোকের সেবা করিয়াছেন। মানুষ তৈয়ারী করা অশ্বিনী বাবু ও জগদীশ বাবুর জীবনের ব্রত ছিল। তাই জগদীশ বাবু শিক্ষকতা কার্য্যই বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আদর্শে আমিও শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের রোষানলে পড়িয়া চিরবাঞ্ছিত শিক্ষকতার কার্য্য ত্যাগ করিতে হইল। জগদীশবাবু আপনাকে বিলোপ করিয়া দিয়াছিলেন। শুনিয়াছি অশ্বিনীবাবু যখন নির্ব্বাসিত হইয়া লক্ষ্ণৌ জেলে আবদ্ধ ছিলেন তখন তাঁর জীবনলিপি লিখিবার জন্য একখানা বাঁধান খাতা দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ফিরিয়া আসিলে বন্ধুগণ সেই খাতাতে কি লেখা আছে জানিতে চাহিলেন। তিনি দেখাইলেন, খাতাখানি শূন্য। দুই পার্শ্বে দৃঢ় মলাট। অশ্বিনী

বাবু বলিলেন, আমার জীবনেরও একদিকে জন্ম আর এক দিকে মৃত্যুরূপ মলাট রহিয়াছে, মাঝখানে সব ফাঁকা। জগদীশ বাবুও নাকি বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার যেন স্মৃতিচিহ্ন কেহ রক্ষা না করেন। অনুরক্ত শিষ্য ও ছাত্রদের পক্ষে এই আবদার রক্ষা করা সম্ভব হইবে কিনা জানি না।

অশ্বিনী বাবু চলিয়া গেলেন, জগদীশ বাবুও চলিয়া গেলেন। বরিশাল আজ শূন্য। কিন্তু তাঁহারা বরিশালবাসীর হৃদয়মন্দিরে উজ্জ্বলভাবে শোভা পাইতেছেন।

আমিও দীর্ঘকাল রোগে শয্যাগত আছি। জগদীশ বাবুর শেষ কালেও তাঁহার চরণতলে যাইয়া বসিতে পারিলাম না। তবে আশা আছে, শীঘ্রই অপরলোকে যাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইব। সেই মিলনের আনন্দের প্রতীক্ষায় এই রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি।

---

# শিষ্য সঙ্গে (১)

একদিন সকালবেলা ( ১৯১০ খ্রীঃ ) এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য্যদেবের গৃহের সম্মুখে উঠানে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সন্ধ্যা-ধ্যান সমাপনান্তে তিনি যখন ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া নিজের ঘরের দিকে আসিতেছিলেন, তখন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আচার্য্যদেব তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে বৃদ্ধ শ্রদ্ধাবিনম্রভাবে উত্তর করিলেন ( অবশ্য বরিশালের উচ্চারণভঙ্গীতে ) "আজ্ঞে, বাখরগঞ্জের শিব দেখিতে আসিয়াছি।" এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের উক্তি বরিশালের জনসাধারণের আচার্য্যদেবের প্রতি স্পষ্ট দৃঢ় ধারণারই প্রতিধ্বনি। তিনি ছিলেন বরিশালের শিব—সৌম্য, শান্ত, সুসমাহিত, তপস্যাদীপ্ত ও মনোরম-কান্তি শিব ঠাকুর।

বালক বয়সে যাঁহাকে দেখিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়া উঠিয়া ছিলেন "এ কাঁচা সোণা কোথায় পেলে অশ্বিনী ?"—তিনি যে বরিশালের লোকের শ্রদ্ধার বস্তু হইবেন তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য ছিলনা। জন্মসুলভ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তাঁহার জীবন গভীরতর সত্যের উপলব্ধির জন্য সর্ব্বদা তপস্যাপরায়ণ ছিল। প্রায়শঃই তাঁহার মুখে এই কথা শোনা যাইত "তপ, তপ, তপ ; নহিলে পত, পত, পত" অর্থাৎ "তপস্যা কর, তপস্যা কর, তপস্যা কর ; নহিলে পতিত হও, পতিত হও, পতিত হও।" শুধু যে তপস্যা ব্যতীত আত্মোপলব্ধি হয় না তাহা নহে, পূর্ব্বকর্ম্মফলে যে উন্নত চরিত্র ও উচ্চ আধ্যাত্মিক অধিকার লাভ ঘটিয়াছে তাহাও রক্ষা

করা সম্ভব হয় না। 'আমি বেশ শুদ্ধ সংযতই আছি, আমার আর তপঃ ক্লেশের প্রয়োজন কি' এই বুদ্ধি করিলেই পতন অনিবার্য্য। আচার্য্যদেব সর্ব্বদা এই কথাই স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত উপদেশ প্রদান করিতেন। এবং তিনি নিজে ছিলেন এই উপদেশের জীবন্ত সার্থকতা।

সুপ্রতিষ্ঠ দেববিগ্রহ যেমন জনসাধারণকে দূর দূরান্ত হইতে আকর্ষণ করে, অথচ নিকটে উপস্থিত হইলে প্রাণে একটা সসঙ্কোচ শ্রদ্ধা, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতার অনুভূতিমিশ্রিত একটা ভয় ভয় ভাব—পাছে দেবতার নিকট কোন অপরাধ হয়—মনের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে, তাঁহার কাছে এই ভাব সকল সময়েই বিদ্যমান ছিল। তাঁহার আদেশ ছিল দেবতার আদেশ, অস্বীকার করিবার উপায় নাই; সেখানে দৃঢ়তা আছে, কঠোরতা নাই, স্নেহ আছে কিন্তু প্রশ্রয় নাই। প্রেমের আকর্ষণে বড় ছোট, ধনী দরিদ্র সকলে ছুটিয়া আসিত, কিন্তু তাঁহার সুসংহত নির্লিপ্ত ভাবের সম্মুখে শ্রদ্ধানিবেদনের চপলতা আপনিই সংযত হইয়া যাইত।

আচার্য্যদেবের দিকে তাকাইলে মনঃপ্রাণ আপনিই পবিত্রতায় ভরিয়া উঠিত। মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের সুপ্রসিদ্ধ ভক্তিযোগ গ্রন্থে লিখিত আছে যে একদিন কামভাব অত্যন্ত প্রবল হইলে কোন তরুণ বন্ধুর রৌদ্রে দেওয়া কাপড়ের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই উত্তেজনা আপনিই থামিয়া গেল। অশ্বিনীবাবু আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন যে, সে বন্ধু আর কেহই নহেন—আমাদের আচার্য্যদেব স্বয়ং। যাঁহার পরিধেয় বস্ত্র দর্শনে চিত্তের চঞ্চলতা দূর হইয়া যায়, তাঁহার জীবন্ত মূর্ত্তি যে চিত্তকে শুদ্ধ পবিত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

অনেকের আজও ধারণা যে ভক্তিযোগের প্রকৃত লেখক জগদীশ-বাবু। অবশ্য তিনি যে লেখক নহেন, তাহার প্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে তাহাদের ধারণার মূলে একটী গূঢ় সত্য বিদ্যমান আছে—আচার্য্যদেবের মধ্যে ভক্তিযোগের আদর্শ মূর্ত্তিমান ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে পাঠকালীন প্রায় দেড় বৎসর কাল আচার্য্য-দেবের আশ্রমে থাকিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত আচার্য্যদেবের ঘরের বারান্দায় একটা লম্বা কাঠের বাক্স অমনি পড়িয়া আছে দেখিয়া একদিন কৌতূহলী হইয়া বয়োবৃদ্ধ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, যে উহা "স্যারের"* বাদ্যযন্ত্রের বাক্স। তিনি পূর্ব্বে উহাতে সঙ্গীতালাপ করিতেন। তাঁহার দেখাদেখি কয়েকজন ছাত্রের সখ বাড়িয়া উঠায়, তিনি তাহাদিগকে প্রতি-নিবৃত্ত হইতে আদেশ দেওয়ার পূর্ব্বে, নিজে উহা চিরদিনের মত বন্ধ করিয়া দেন। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" তবে না আচার্য্য হওয়া যায়? বরিশালের সঙ্গীতজ্ঞগণ সকলেই একবাক্যে আচার্য্যদেবের সঙ্গীতশাস্ত্রে গভীর পারদর্শিতা ও ব্যুৎপত্তির সাক্ষ্য

* ছাত্রগণ শিক্ষককে "স্যার" বলিয়া সম্বোধন করে। কিন্তু আচার্য্যদেব ছিলেন বরিশালের সকলেরই 'স্যার'। "স্যারে" বলিয়াছেন, 'স্যারের বাসা" বলিলে আচার্য্য-দেবকেই বুঝাইত। তাঁহার এই সর্ব্ববাদিসম্মত ব্যাপক "স্যার" উপাধি, তিনি যে সকলেরই আচার্য্য এই কথার স্পষ্ট প্রমাণ ছিল। একদিন এক পত্রের শিরোনামায় কোন ভদ্রলোক লিখিয়াছিলেন "Sir Jogadish Mukherjee", তিনি শিরোনামা দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "এরা আমাকে Sir উপাধি দিয়ে জেলে পোরার বন্দোবস্ত করবে দেখ্ছি।" (সম্রাট কর্ত্তৃক যাহারা Knighthood প্রাপ্ত হন, তাহাদের নামের আগেই মাত্র "Sir" শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে)।

দিবেন। আমি নিজে অনেক দিন দেখিয়াছি, তিনি কত রসবোধ ও আনন্দের সহিত সঙ্গীতবিজ্ঞান সম্বন্ধে অপরকে উপদেশ দিতেছেন, অথচ ছাত্রদের মঙ্গলার্থে সঙ্গীতযন্ত্রের সহিত চিরবিচ্ছেদ স্বেচ্ছায় ঘটাইয়া ছিলেন—কতখানি ত্যাগ, সংযম ও ছাত্রদের মঙ্গল ইচ্ছা থাকিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে? দূষণীয় বস্তু বা অভ্যাস ত্যাগ প্রশংসার্হ বটে, কিন্তু অপরের কল্যাণার্থ নির্দ্দোষ আনন্দবর্জ্জনে কতখানি প্রাণের দরকার হয়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সুকঠিন।

ছাত্রদের মঙ্গলের জন্য এই ত্যাগস্বীকার অপেক্ষা অধিকতর কঠোর ছিল তাঁহার নিরামিষাহার ও ব্রতোপবাসাদি ত্যাগে। যাহারা শ্রেষ্ঠ ও সম্মানার্হ তাহাদের বাহ্যিক আচারের অনুকরণ করার প্রবলতা ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট বিদ্যমান—কিন্তু তদনুযায়ী চরিত্রগঠন ও যোগ্যতার্জ্জন করার সাধনা গ্রহণে বড় কেহ অগ্রসর হইতে চাহে না। ফলে দুই দিন খুব মাতামাতি, বাড়াবাড়ি করিয়া তাহারা সব ছাড়িয়া দেয় এবং পরিশেষে বিজ্ঞের মত মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকে "মশাই, ঢের করে দেখেছি, ওর আদবে কোনই মূল্য নাই।" চরিত্র সাধনার আন্তরিক প্রেরণা বা প্রয়োজন বোধ ব্যতীত ব্রতোপবাস, হয় ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা, না হয় ভণ্ডামীর সৃষ্টি করিয়া থাকে। অযোগ্য অনধিকারীর অনুকরণস্পৃহা অমঙ্গলকর বলিয়া তিনি তাহাদের সে সুযোগ না দেওয়ার জন্য নিজে সাধারণ দশজনের মতই চলিতেন; কিন্তু বিশেষ বিশেষ ছাত্রদের বেলায় আপত্তি ত দূরের কথা, সম্মতিই দিতেন। আমি যখন তাঁহার সহিত ছিলাম, তখন আশ্রমের কয়েকজনেই একাদশীর উপবাস করিত, কেহ কেহ নিরামিষও খাইত।

আচার্য্য শঙ্করের জীবনীপাঠ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

মহারাজের ( তখন সতীশবাবু ) সহিত মাখামাখির ফলে বেদান্তের অদ্বৈতবাদের প্রতি আমার একটু বেশী বেশী ঝোঁক জন্মে। নির্ব্বাণষট্‌কের আবৃত্তি ও "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বড় বড় কথা অনর্গল বকিতে থাকিতাম। আচার্য্যদেব দুই চারিদিন আমার এই শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিলেন এবং একদিন যখন আমি খুব উৎসাহের সহিত আবৃত্তি করিতে ছিলাম "পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্" তিনি হাসিয়া বলিলেন ( তিনি যে কাছে বেড়ার ওপাশে ছিলেন সে হুঁস আমার ছিল না ) "ব্যস্, তোমার বাবাকে লিখে দিচ্ছি, আর তোমাকে পড়ার খরচ পাঠাতে হবে না, তোমার ত পিতা মাতা কিছুই নাই।" তৈল ঢালিলে যেমন ডালের উতাল আপনি পড়িয়া যায় তাঁহার এই বাক্যে আমার অদ্বৈতবাদের উচ্ছ্বাস একেবারেই থামিয়া গেল। তাঁহার এই স্নেহপূর্ণ তিরস্কারহীন মন্তব্য আমার অযোগ্যতা যেমন স্পষ্ট করিয়া দিল, বোধ হয় কোন পণ্ডিতের শত যুক্তি তর্ক তাহা পারিত না।

তিনি আমার অনধিকার বাগাড়ম্বরকে বন্ধ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না; তিনি জানিতেন, যে ধর্ম্মস্পৃহা এই অদ্বৈতবাদের উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার জন্যও কিছু করা একান্ত প্রয়োজন। তাই একদিন দুপুর বেলা ঘরে বসিয়া যখন সমবয়সীদের সঙ্গে আড্ডা দিতেছিলাম, এমন সময় আচার্য্যদেব আমার নাম ধরিয়া ডাক দিলেন। ত্রস্তপদে ভয়ে ভয়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম, বুঝি বা আড্ডা দেওয়ার জন্য তিরস্কার করিবেন। তিনি আমার দিকে স্থিরনেত্রে তাকাইয়া বলিলেন "তোমার Motto—ধর্ম্মাদর্শ লিখে নাও—অনায়াসেন মরণং, বিনা দৈন্যেন জীবনমরাধিতগোবিন্দ-

চরণস্য কিং ভবেৎ—অর্থাৎ মরণে কোন প্রকার দুঃখবোধ এবং জীবনযাপনে দৈন্যভাব থাকিবে না, কিন্তু সকল সময়ে মনে রাখিতে হইবে গোবিন্দের চরণ ভজনা না করিলে কিছুই হইল না।"*

আমার ম্যালেরিয়া জ্বর ছিল, সুতরাং খাওয়া দাওয়া, চলা ফেরা, বহু বিধিনিষেধ মানিতে হইত। তন্মধ্যে একটী ছিল—কলা খাওয়া নিষেধ; অথচ উহা আমার অতিশয় প্রিয় খাদ্য। তাই একদিন ঠাকুর ঘরের একটী প্রসাদী কলা, যখন ঘরে কেহ নাই তখন পরদার আড়ালে বসিয়া খাইয়া ফেলিলাম, ভাবিলাম কেহ জানিতে পায় নাই। কিন্তু রাত্রে আচার্য্যদেব আমাকে বলিলেন, "গোপনে কলা খেলে জ্বর ভালো হবে কেমন করে?" আমি ত অবাক্ হইয়া গেলাম। তিনি কেমন করিয়া জানিলেন? আজ পর্য্যন্ত এই ব্যাপারটি আমার কাছে রহস্যাবৃত আছে।

আর একদিনের কথা মনে আছে। সকালবেলা ঘরে বসিয়া পড়িতেছি, এমন সময় তিনি ডাক দিলেন। তাঁহার ঘরে উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "বল, দৈব কি পুরুষাকার বড়?" আমি উত্তর দিলাম "পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলই এ জন্মে দৈবরূপে প্রকাশ পায়, এবং আমাদের সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক হইতে শ্লোকটী বলিলাম—"যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ তথা পুরুষাকারং বিনা দৈবং ন সিধ্যতি" অর্থাৎ যেমন একচক্রে রথ চলিতে পারে না তেমনি দৈবও পুরুষাকার ব্যতীত ফলবতী নহে। তিনি ঘরে উপস্থিত জনৈক

---

* এতদ্ব্যতীত চলা ফেরা, বিশেষ ভাবে, দৃষ্টিসংযমবিষয়ে তিনি অনেক উপদেশ দিয়াছেন; কারণ দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়াই ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য বিশেষ ভাবে ঘটিয়া থাকে। মনঃসংযম দ্বারা কি প্রকারে চক্ষুর দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করা যায় সেই যৌগিক প্রক্রিয়াও শিখাইয়া ছিলেন।

প্রবীণ ভদ্রলোককে বলিলেন "কেমন, আপনার উত্তর মিলিল ত ?" আচার্য্যদেব এক ঢিলে দুই পাখী মারিলেন—আমার পড়াশুনা ঠিকমত হইতেছে কিনা, তাহার পরীক্ষা হইল এবং জিজ্ঞাসু ভদ্রলোকের উত্তরও মিলিল।

আমার এক বালক ভ্রাতুষ্পুত্র ভোলানন্দ গিরি মহারাজের নিকট দীক্ষা পায় এবং দীক্ষার নির্দ্দেশানুযায়ী মৎস্যাহার নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং তাহার পিতা তাহার মাছ বন্ধ করিয়া দেন। বালকের কিন্তু মাছের প্রতি ভীষণ লিপ্সা ছিল। দুই চারি মাস কোন রকমে কাটিয়া গেল, কিন্তু "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি" ( প্রাণিগণ স্ব স্ব প্রকৃতির অনুযায়ী চলিতে বাধ্য, নিগ্রহ কি করিতে পারে ) ? বালকটী সমবয়স্ক বোন্‌দের সঙ্গে বসিয়া খাওয়ার জিদ ধরিল ; এবং অপরের অলক্ষ্যে প্রথমে মাছের ঝোলে মাখা ভাত, পরে দুই এক টুক্‌রা মাছেরও সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিল। আচার্য্যদেবের কাছে এই ব্যাপার উত্থাপন করা হইলে তিনি তাহাকে তিথি ও বারের নিষিদ্ধ দিন বাদ দিয়া অন্য দিনে মাছ খাইতে বলিলেন—প্রকৃতির উপর জবরদস্তি করিতে নাই, ধীরে সুস্থে সংযত করাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

১৩১৫ কি ১৩১৬ সালে বরিশালে এক ভীষণ সামাজিক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়—শ্রীযুত গণেশচন্দ্র দাস মহাশয়ের বিধবা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ সম্পর্কে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই মিথ্যা সংস্কার সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, বিধবা-বিবাহ অতিশয় পাপজনক এবং বিধাতার ইচ্ছার উপর ইচ্ছা পরিচালনা। ঘৃণা, ক্রোধ ও ক্ষোভে সমাজ ক্ষেপিয়া উঠিল। কিন্তু বিস্ময়, অতিশয় বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল এই যে, এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগকর্ত্তা চিরকুমার ব্রহ্মচারী বরিশালের ধর্ম্মাদর্শ আচার্য্য জগদীশ! চারিদিকে তুমুল কোলাহল

উত্থিত হইল। যেমন সমুদ্রের ক্রুদ্ধ তরঙ্গোচ্ছ্বাস পাহাড়ের পদতলে আছাড় খাইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, তেমনি সমাজের জড় সংস্কারের আক্রোশ আচার্য্যদেবের নিকট আসিয়া যেন কেমন ব্যর্থ ও হতমান হইতে লাগিল।

সেই সময় একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি বিধবা বিবাহ দিতে চাচ্ছেন কোন্ শাস্ত্রযুক্তিতে?" তিনি দৃঢ়তার সহিত ধীরে উত্তর করিলেন, "শাস্ত্রবিচারের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বই পড়ে নেবেন।" পণ্ডিতজীর তর্ক করিবার আগ্রহ এই উত্তরে নিভিয়া গেল, তিনি আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন।

শুধু কি জনসাধারণ ও পণ্ডিতগণকে লইয়া ফ্যাঁসাদ ছিল? তাঁহার প্রিয় ছাত্র ও ভক্তসেবকগণ মধ্যেও বিরোধীতার ভাব প্রকাশ পাইল—'ইনি এ কি করিতেছেন!' এই ঘটনার প্রায় ষোল বৎসর পরে আচার্য্যদেবের ঘরে বসিয়া বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গ উঠিলে আচার্য্য-দেবের জনৈক অতিপ্রিয় ও ভক্তসেবক অনুযোগের স্বরে বলিয়া উঠিলেন "আপনার এ সব কাজের যুক্তি আমরা খুঁজিয়া পাই না, আমাদের মোটেই ভাল ঠেকে নাই।" আচার্য্যদেব অতিশয় দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন, "আমার জীবনে এর চেয়ে ভাল কাজও আর কিছু করি নাই।" কয়েকজন ভক্ত সেবকের মত আমিও বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিতে একান্ত কুণ্ঠিত ছিলাম এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত খণ্ডনার্থ স্মৃতিগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম এবং শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের স্পষ্ট সমর্থন দেখিতে পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম সুতরাং আস্তে আস্তে বলিলাম, "শাস্ত্রে যখন বিধবা বিবাহের কথা আছে, তখন আর বিরোধীতা করিতে

পারি না।" তিনি পূর্ব্ববৎ তেজের সহিত উত্তর করিলেন, "আমি ইহাকে অন্তরের সহিতই সমর্থন করি।"

নারী-কামনা পরিত্যাগ যে ব্রহ্মচারীর জীবনে একটী ভিত্তিমূলক আদর্শ, নারীর প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা সেই ব্রহ্মচারীর কতদূর ছিল তাহা তাঁহার বিধবা-বিবাহ ও নারীর উন্নতিকর শিক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টার মধ্যে অতিশয় স্পষ্ট ছিল। নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ না করার হেতু তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির অভাব নহে, ইন্দ্রিয়সংযমের উচ্চতর আদর্শই উহার কারণ ছিল। বরিশালে নারী স্বাধীনতা ও নানাবিধ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার প্রধান কার্য্যকরী প্রেরণা পরোক্ষভাবে আচার্য্যদেবের আশ্রম হইতেই সৃষ্ট হয়। প্রতি রবিবার পুরুষগণের মত বহু মহিলাও কীর্ত্তন ও শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণের জন্য তাঁহার আশ্রমে সমবেত হইতেন। যেমন তীর্থভূমিতে নারীর অবরোধ নাই, তেমনই তাঁহার আশ্রমতীর্থের আকর্ষণ অজ্ঞাতসারে অবরোধ প্রথা দূরীকরণে সহায়তা করিয়াছিল।

আচার্য্যদেবের শাস্ত্রে গভীর শ্রদ্ধা ও উপলব্ধি অসীম পাণ্ডিত্য-মণ্ডিত হইয়া যখন উপদেশ ও শাস্ত্র ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইত, তখন একান্ত শাস্ত্রবিমুখের নিকটও শাস্ত্র মধুর ও হৃদয়-গ্রাহী হইয়া উঠিত। মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের এই সম্বন্ধে একদিনের মন্তব্য আচার্য্যদেবের পাণ্ডিত্য ও গূঢ় উপলব্ধি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা জন্মাইতে পারিবে। "ছ্যাখ্, জগদীশকে আমিই প্রথমে ভাগবত পড়াই, আর আজ আমিই তার পাঠ শুন্‌তে আসি।" তিনি প্রতি রবিবার প্রায় একঘণ্টা কি দেড়ঘণ্টা কাল শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন। তখন সমুদায় শ্রোতা উৎকর্ণ ও নিস্তব্ধ হইয়া থাকিত, সুমধুর সঙ্গীত বা কীর্ত্তন লোককে এতদূর মুগ্ধ করিত না।

রবিবার ব্যতীত অন্যান্য পর্ব্বদিনেও তৎ তৎ দিনের উপযোগী ধর্ম্মব্যাখ্যা ও মহাপুরুষ-জীবনী আলোচনা হইত। বৌদ্ধ, শিখ, এমন কি ক্রিশ্চিয়ান্ ও ইসলাম ধর্ম্মসমাজের পর্ব্বদিনেও তাহাদের শাস্ত্রতাৎপর্য্য ও মহাপুরুষ-জীবনী আলোচিত হইত। যদিও সনাতন ধর্ম্মকে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিতেন, তথাপি অন্য ধর্ম্মের প্রতি তিনি উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কদাচ কার্পণ্য করেন নাই। তাই অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণও তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত।

একদিন অক্স্ফোর্ড মিশনের রেভারেণ্ড ফচেট্ সাহেব বলিতে-ছিলেন "খৃষ্টান না হইলে আর প্রাণের কোন ভরসা নাই।" আমার জনৈক আত্মীয় তাঁহাকে তখনই প্রশ্ন করিলেন, "আপনার মতে ত তাহা হইলে জগদীশবাবুও ত্রাণ পাইবেন না।" উত্তরে সাহেব বলিলেন "জগদীশবাবু ত্রাণ পাইবেন, কারণ তিনি গুপ্তভাবে খৃষ্টান আছেন।"

তাঁহার সমুদায় ধর্ম্মমতে উদারভাব যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছিল, তেমনি তাঁহার প্রেমভাব তাঁহাকে অজাত-শত্রু করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার এই প্রেমভাব শুধু মানুষে আবদ্ধ ছিল না, সকল জীবজন্তুতেই প্রসারিত হইয়াছিল। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন—তখন পাতঞ্জলের "অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ (অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার নিকটে অপর জন্তুরও বৈরভাব ত্যাগ হয়) কথার ব্যাখ্যা আমাদের নিকট করিতেছিলেন —"দেখ এ কথা অতিবাস্তব, আমি যখন অহিংসা সাধনায় ভরপূর ছিলাম তখন প্রত্যক্ষ করেছি মশা গায়ে বসে' অপ্রস্তুত হয়ে উড়ে গেছে, ছারপোকা কামড়ায়নি।"

সুতরাং তিনি রাষ্ট্রক্ষেত্রে হিংসাবাদ পছন্দ করিতে পারেন নাই

এবং যাহাতে উহা তাঁহার আশ্রমের ভিতর প্রবেশলাভ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে অতিশয় হুঁসিয়ার ছিলেন।

যদিও বাহিরে জনসাধারণের চক্ষে কর্ম্মীরূপে তাঁহাকে খুব কমই দেখা যাইত, তথাপি তাঁহার প্রেমের উৎস সকল সময়েই আর্ত্ত, পীড়িত ও দরিদ্রের জন্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত—কিন্তু এ উচ্ছ্বাস কখনো বিবেচনাহীন ভাবে ঘটিত না। কেহ আসিয়া কান্নাকাটি করিলেই যে তিনি গলিয়া যাইতেন অর্থাৎ প্রয়োজনের হিসাব না করিয়া কাতরতা-প্রকাশ-সামর্থ্য দেখিয়া দান করিতেন তাহা মোটেই নহে। স্থিরভাবে সকল কথা শুনিয়া তিনি নাম, ধাম, ঠিকানা জানিয়া লইতেন, পরে খোঁজ করিয়া প্রয়োজনানুসারে সাহায্য করিতেন; সুতরাং কাতরোক্তিদ্বারা মন ভিজাইয়া তাঁহার নিকট হইতে দান আদায় করা সম্ভব ছিল না। তাঁহার প্রেম ও সেবা, বুদ্ধি, যুক্তি ও বাস্তবতা অবলম্বন করিয়াই কার্য্যকরী হইয়া উঠিত—ভাব-প্রবণতার তরল উচ্ছ্বাসকে তিনি মোটেই প্রশ্রয় দিতেন না। দরিদ্র বান্ধব সমিতি, রামকৃষ্ণমিশন ও কালীশচন্দ্র আতুরাশ্রম পরিচালনার মধ্য দিয়া তাঁহার করুণ সেবাভাব ও সংযত বিচারবুদ্ধির পরিচয় লাভ করা যাইতে পারিত।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সঙ্গীতের এই কয়েকটী পংক্তি তাঁহার সেবাদর্শের আংশিক পরিচয় প্রদান করিবে ঃ—

অগ্নিদাহে কেহ সর্ব্বস্ব খোয়ায়,
দাঁড়ায়ে না রব পুতুলের প্রায়,
রোগীর শিয়রে, মৃত্যুর শয্যায়,
জাগিব, গাইব তোমার নাম।

এই শ্লোকটী আচার্য্যদেবেরই রচনা। তিনি আমাদিগকে সেবা-

কার্য্যে উপদেশ দেওয়ার সময় বলিয়া দিয়াছিলেন যে, "সেবাকালে মনে মনে খুব নাম কর্‌বি, তাতে নিজের মন প্রফুল্ল, সেবাকার্য্য অধিকতর মধুর এবং রাত্রে নিদ্রাভাবের জন্য যে শারীরিক গ্লানি ও অবসাদ সম্ভব, তাহাও দূর হইয়া যাইবে।" তাঁহার উপদেশের বাস্তবসত্যতা সম্বন্ধে বহু সেবককর্ম্মীই সাক্ষ্য দিবেন।

যাঁহার নেতৃত্বে বরিশালের প্রায় সমুদায় সেবাপ্রতিষ্ঠানই পরিচালিত হইত, তিনি কিন্তু কর্ম্মকোলাহল হইতে দূরে আত্ম-গোপন করিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন, অপরের হাতে যথাসম্ভব কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দিয়া। তাই যখন একে একে তাঁহার সহকর্ম্মিগণ এই মরধাম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, তখন বৃদ্ধবয়সে আচার্য্যদেব জনসাধারণের চক্ষে কর্ম্মীরূপে প্রকাশিত হইতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং যাহারা তাঁহার যৌবনের কর্ম্মবিকাশ লক্ষ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে শুধু আত্মসমাহিত ভক্তযোগী বলিয়াই ধারণা পোষণ করিতেন, তাহারা কতকটা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তিনি শুধু দৈহিক সেবা দিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না, মানুষের আধ্যাত্মিক সেবাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন; তাই তাঁহার আশ্রমে কর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মভাবই অধিকতর জাগ্রত ছিল। বর্ত্তমান শিক্ষালয়ে ধর্ম্ম ও চরিত্রসাধনা শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা অতিশয় কম; এই জন্য তিনি "বাল্যাশ্রম" গঠন করিয়া উহার কর্ত্তৃত্বভার সেবা-কার্য্যের মত পণ্ডিত কালীশচন্দ্রের উপর অর্পণ করেন—যদিও আচার্য্য তিনিই ছিলেন। বাল্যাশ্রমে ভারতের ছাত্রাদর্শকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার শিক্ষা দেওয়া হইত।

যদিও বহুবৎসর ব্রজমোহন কলেজের লজিক্‌ ও গণিতাধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলেন তথাপি ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপেই

তিনি জনসমাজে পরিচিত। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও পরিচালক তাঁহারই অন্তরঙ্গ বন্ধু ভারতবিখ্যাত অশ্বিনীকুমার। তাঁহাদের গভীর বন্ধুত্বের কথা অশ্বিনীবাবুর মুখে আমরা অনেক শুনিয়াছি। এত ভালবাসা সত্ত্বেও একবার বিদ্যালয়ের কার্য্যচালনা সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় তিনি ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কার্য্য ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, বন্ধুত্বের স্বর্ণ আবরণ তাঁহার সত্য বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। অবশ্য পরে এই ব্যাপারের মীমাংসা হইয়াছিল।

রবিবার দিন আশ্রমে লোকসমাগম হেতু বর্ষাকালে কাদাটা একটু বেশীই হইত। তাহাতে সমাগত ভক্তগণের অসুবিধা হইত। এতদ্দর্শনে জিলাস্কুলের জনৈক বহুভাষী শিক্ষক আশ্রমস্থ তরুণ বালকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া ছিলেন "তোমরা মিউনিসিপালিটীর রাস্তায় যে ইটের স্তূপ আছে, তার কতকগুলি এনে ত দিতে পার?" তাঁহারা এই কথা আচার্য্যদেবের কর্ণে প্রবেশমাত্র তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন, "তুমি ছেলেদের চোর হইতে শিখাইও না।" জিলাস্কুলের শিক্ষকটী বলিলেন "ও ইট ত সর্ব্বসাধারণেরই। উহা আনিলে চুরি হইবে কেন?" তিনি উত্তর করিলেন "হাঁ, উহা নিশ্চয়ই চুরি— উহা সর্ব্বসাধারণের রাস্তার জন্য, তোমার আমার বাসার ব্যবহারের জন্য নহে।" আমরা রাস্তার ইট আনিলে যে চুরি করা হয় ইহা মনে করিতাম না, যেমন রাস্তার ধারের কুল বা জামগাছের ফল খাওয়ায় কোন চুরি হয় না, তেমনি মনে করিতাম। কিন্তু আচার্য্যদেবের কথায় আমাদের ভ্রান্ত ও মলিন বুদ্ধি শুদ্ধ হইয়া চৌর্য্যব্যাপারের স্বরূপ আরও নিগূঢ় ভাবে বুঝিতে সক্ষম হইল।

আচার্য্যদেবের বাহ্যিক নির্লিপ্ত ভাবের পশ্চাতে ভক্ত ও ছাত্রগণের প্রতি দরদ ও তাহাদের উন্নতি কামনা কত প্রবল ছিল, আমার

ব্যক্তিগত দুই একটী ব্যাপারে তাহা বেশ টের পাইয়াছি। এম্, এ, পাশ করিয়া কেবলমাত্র সংসারক্ষেত্রে ঢুকিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময়ে আচার্য্যদেবের সামাজিক শিক্ষার বিরোধী এক কার্য্য করিয়া অতিশয় সঙ্কোচের সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহার মুখ একেবারে মলিন হইয়া গেল, হৃদয়ভেদী এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বলিলেন "যাঃ, যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াব, সেই সরষেই ভূতে পেয়েছে!" এই কথা বলিয়াই তিনি মনঃকষ্টে নীরব হইলেন। আমিত মরমে মরিয়া গেলাম। সমস্ত মনপ্রাণ আত্মগ্লানিতে ভরিয়া উঠিল, তখনই মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, আমাদের পরিবার হইতে বরপণপ্রথা দূর করিতে হইবে এবং এই সঙ্কল্পে কৃতকার্য্যতা লাভও করিতে পারিয়াছি।

যুদ্ধের শেষভাগে যখন কাপড় দুর্ম্মূল্য হওয়ার জন্য গরীব কাঙ্গালের একান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল, তখন আচার্য্যদেবের তত্ত্বাবধানে বস্ত্রবিতরণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। এ সম্পর্কে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী ঝুনঝুন-ওয়ালার নাম স্মরণীয়, তিনি বহু কাপড় দান করেন। আমাদের উপর দুঃস্থ ও নিঃস্ব লোকের খোঁজ করিয়া তাহাদিগকে কাপড় দেওয়ার ভার পড়ে এবং তদনুসারে যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করি। তিনি সকল বিষয়েরই সংবাদ লইতেন এবং এই কার্য্যের পর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি প্রফুল্লচিত্তে আমাকে বলিলেন "না, যা আশঙ্কা করে-ছিলাম তা হয়নি, সরষেকে ভূতে পায় নি।" যেমন ধিক্কার দ্বারা ত্রুটি দেখাইয়া দিয়াছিলেন, তেমনি প্রশংসাদ্বারা উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন। যাহারা শুধু ত্রুটি দেখায় তাহারা সংশোধনের চাইতে ছোট করিয়া ফেলে অনেক বেশী। পূর্ব্বে আমাকে যে তিরস্কার করিয়াছিলেন সে প্রায় ছয় মাস আগে, অথচ সেকথা মনে রাখিয়া ঠিক প্রশংসাদ্বারা

আত্মপ্রত্যয়কেও তিনি জাগ্রত করিয়া দিলেন। এই ব্যাপার স্পষ্ট প্রমাণ দিল যে তিনি কতখানি দরদ ও মঙ্গলকামনাদ্বারা তাঁহার অনুগতগণকে পরিচালনা করিতেন।

যুদ্ধের পর শাসনসংস্কার সম্পর্কে রাষ্ট্রালোচনার সূত্রপাত হইয়া নরম ও গরমপন্থীর মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছেদ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বেশ প্রকাশ পাইল। নরমপন্থিগণ সরকারের আনুগত্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাদিগকে তীব্র আক্রমণ করা হইতে লাগিল। একদিন শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ (তখনো দেশবন্ধু হয়েন নাই) দেশনেতা সুরেন্দ্র-নাথকে অতিশয় তীব্রভাষায় আক্রমণ করেন। সেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আচার্য্যদেব ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, দেশপূজ্য লোককে সমালোচনা করা অতিশয় অসঙ্গত হইয়াছে। আমি ব্যারিষ্টার দাশ মহাশয়কে সমর্থন ও সুরেনবাবুকে সমালোচনা করিতে উদ্যত হইলেই তিনি আমাকে ধমক দিলেন, "সুরেনবাবুর নিন্দা ও গুরুনিন্দা সমান, আমার সাম্‌নে তা হ'তে পারে না, চলে যাও আমার ঘর থেকে।" যাঁহাকে দেশশুদ্ধ লোক মান্য করে তাঁহার সম্বন্ধে চপল সমালোচনা শোনাও সঙ্গত নহে—করাও সঙ্গত নহে।

আমি চলিয়া গেলাম; কয়েকদিন পরে আবার দেখা হইলে তিনি স্নেহের সহিত বলিলেন "আমি ভেবে দেখ্‌লাম তোমার কথাই ঠিক, সুরেনবাবুর বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতি জাতীয় আদর্শের অনুকূল নয়, তোমাকে মন্দ বলা আমার ঠিক হয়নি।" আমার মত সর্ব্বরকমে ক্ষুদ্র ও নগণ্য ব্যক্তির নিকট (তখন আমি তরুণ যুবক মাত্র, সবে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি) এই প্রকার ত্রুটি স্বীকার কত বড় মহানুভবতা, তাহা আজকালকার তথাকথিত নেতৃগণের মেজাজ-সম্বন্ধে যাহারা অবগত আছেন তাহারা বলিতে পারিবেন।

অহিংসা-মূলক রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যে তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলেও, তিনি উহাকে অন্তরের সহিত সমর্থন করিতেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়, ১৯২১ সালে, যখন শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়ি, তখন তিনি প্রশংসাপূর্ণভাবে আমার কার্য্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। যদিও কার্য্যতঃ তাঁহাকে অসহযোগ ব্যাপারে যোগ দিতে হইয়াছিল, তথাপি তিনি নিজমত স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিতেন। অশ্বিনীবাবু ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশ্লিষ্ট করিলে তিনি পূর্ব্ববৎ উহার প্রধান রহিলেন, কিন্তু স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিলেন "আমার ব্যক্তিগত কোন মত এ কার্য্যে নাই, আমি অশ্বিনীবাবুর কর্ম্মচারীমাত্র এবং তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে কাজ করিতেছি।" পাছে ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়া পরিচালনা করার কৃতিত্ব কেহ ভুলক্রমে তাঁহার উপর আরোপ করে এইজন্যই তিনি প্রকাশ্যভাবে নিজমত জ্ঞাপন করিয়া ছিলেন। জাতীয় শিক্ষার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব ছিল, একথা ইহাতে প্রমাণিত হয় না। কারণ কয়েক বৎসর পরে অশ্বিনীবাবু ইহধাম ত্যাগ করিয়া গেলে, ব্রজমোহন বিদ্যালয় আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। তখন কিন্তু তিনি আর উহার শিক্ষকতা করেন নাই, পরন্তু শ্রীযুত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে ও আমাদের সহযোগীতায় যখন নূতন জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি উহার সর্ব্ববিধ আনুকূল্য ও মঙ্গলকামনা করিয়া ছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রতিদিন পাঠারম্ভের পূর্ব্বে বন্দেমাতরম্ স্তোত্রের সঙ্গে এই স্তোত্রটী পাঠ করিতে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন :—

স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাম্।
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া ॥
চেতস্তু ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে।
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী ॥

"বিশ্ববাসীর মঙ্গল হউক, খলব্যক্তি প্রসন্নভাব ধারণ করুক, প্রাণিগণ পরস্পরের প্রতি মনে মনে মঙ্গলচিন্তা করুক, আমাদের ভদ্র চিত্ত অধোক্ষজ হরির ভজনা করুক এবং আমাদের মধ্যে অহৈতুকী মতি প্রবেশ করুক।"

দুর্নীতিপরায়ণ পতিত ব্যক্তি সাধুপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও সমাজের লোক তাহাকে ঘৃণা করিয়া থাকে ( অবশ্য সে যদি খুব ধনী ও প্রতিপত্তিশালী লোক হয়, তবে কেহ বড় ঘৃণা করিতে যায় না, পরন্তু তাহার আনুগত্য করিয়া থাকে ) বিশেষতঃ সে যদি দরিদ্র ও নারী হয়। বাজারের বেশ্যার সম্বন্ধে ত কোন কথাই উঠে না। দুর্ব্বল অসহায়ের উপর আমাদের নীতিবুদ্ধি অতিশয় জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল থাকিয়া মানুষের পুণ্যপথকে যে কত ভাবে রুদ্ধ করে, সে করুণ কাহিনী বিবৃত করিবার স্থান এ নহে। কোথায় সেই আচার্য্য কণ্বপের সাত্ত্বিকসাধনা যাহা পতিপরিত্যক্তা শকুন্তলাকে সাগ্রহে আশ্রমে স্থান দিয়াছিল—কোথায় সেই মহাপ্রাণতা! হিন্দু-সমাজের দিকে তাকাইলে ভণ্ড নীতিজ্ঞান নারীজাতির উপর কি প্রকার উৎপীড়ন করিতেছে তাহা দেখিয়া হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু যে দিন বাজারের বেশ্যা সুখদা পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া সাধু-জীবন-যাপনের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করিল, এই মহাপ্রাণ আচার্য্যদেব তাহাকে ঘৃণা করা ত দূরের কথা, সাদরে কন্যার মত বরণ করিয়া নিলেন। ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীতে বাসস্থান ও উপজীবিকার পন্থা নির্দ্দেশ

করিয়া দিলেন। সমাজের চপল মন্তব্যে কাণ দেওয়ার মত দুর্ব্বল মন তাঁহার কোন দিনই ছিল না।

যে সমাজসংস্কারপ্রয়াস বিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছিল, তাহা যখন সংঘবদ্ধভাবে হিন্দুমহাসভার মধ্য দিয়া কার্য্যকরী হইয়া উঠিতে উদ্যত হইল, তখন তিনি সানন্দে উহাতে যোগদানকরতঃ বরিশাল হিন্দুমহাসভার সভাপতি পদ গ্রহণ করেন। শুদ্ধি, সংগঠন, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত বরিশাল জিলা হিন্দু সম্মেলনের সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। অভিভাষণ লেখা ব্যাপারে তাঁহার সেক্রেটারীর কাজ করিবার সৌভাগ্যলাভ আমার ঘটিয়াছিল এবং তদুপলক্ষে সমাজসংস্কার বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক আগ্রহের সহিত আমার আরও ঘনিষ্ঠতর জ্ঞান লাভ ঘটিয়াছিল। অবশ্য সকলেই একবাক্যে তাঁহার অভিভাষণকে সর্ব্বরকমে উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছিল তাহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই।

গঠনমূলক রাষ্ট্রান্দোলনে তাঁহার সহানুভূতি থাকিলেও জন-সেবা, চরিত্রগঠন, ধর্ম্মাদর্শ প্রতিষ্ঠা ও প্রচার এবং সমাজসংস্কার ছিল তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কার্য্য। সুতরাং আমাকে সমাজান্দোলনে বিশেষ ব্রতী দেখিয়া তিনি অতিশয় সন্তোষ লাভ করেন এবং আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি পিতৃত্বের ভার নিয়ে তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, যেন তুমি আমাদের আশা পূর্ণ কর্ত্তে পার।" নিজের শক্তি ও সাধনার দিকে তাকাইলে কোন ভরসা পাই না; তবে যদি কিছু সম্ভব হয় ত এই মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদে—কারণ উহা ত দেবতার বর!

আচার্য্যদেবের সংস্কারান্দোলনে যোগদান ব্যাপার গোঁড়া ভক্তদের কাছে মোটেই ভাল ঠেকে নাই; অথচ আচার্য্যদেবকে অশ্রদ্ধা করা বা তাঁহাকে মিথ্যা কার্য্যকারী মনে করিবার মত মনোবৃত্তিও ভক্তদের মধ্যে ত দূরের কথা, বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যেও কাহারও ছিল বলিয়া জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, গোঁড়াদলের ভক্তগণ এই কথা বলিয়া নিজেদের মনে প্রবোধ আনিয়াছিল—উহা নরেন প্রমুখ স্নেহাস্পদের প্রতি স্নেহের ফল—বাস্তবিক এই সব কাজ তাঁহার অন্তরের হইতে পারে না। যিনি সত্যের কাছে সব বিসর্জ্জন দিতে পারেন, তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার ভক্তদের এই প্রকার ধারণা তাহাদেরই চিত্তের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। যিনি আমাদের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে মানসপুত্রত্বের সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন আজ তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তভাবের কথা বড়ই মনস্তাপের সন্দেহ নাই। অবশ্য তাহারা যে সত্য জানে না বা বোঝে না তাহা নহে; মনকে প্রবোধ দেওয়ার এ এক অতি দুর্ব্বল পন্থা মাত্র।

আচার্য্যদেবের কোন লৌকিক গুরু ছিলেন বলিয়া আমরা জানি না। লৌকিক গুরুর প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করিলেও উহা যে সকলের জন্যই অবশ্য প্রয়োজনীয় এ কথা তিনি মানিতেন না। দীক্ষা ও গুরুকরণ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন "মহাপুরুষ যেমন গুরু হইতে পারেন, তদ্রূপ নিজের আত্মাও গুরু হইতে পারে।" গীতার নিম্নলিখিত কথা বিশ্বাস করিলে লৌকিক গুরুর অপরিহার্য্যতা সকলের সম্বন্ধে খাটে না:—

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥

* * *

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥

অর্থাৎ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি শুচি ও শ্রীমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন অথবা ধীমান্ যোগীর কুলে। সেখানে পূর্ব্বদেহে লব্ধ বুদ্ধিসংযোগ লাভ করিয়া পুনর্ব্বার সিদ্ধির জন্য সাধনা করিতে থাকেন। পূর্ব্বাভ্যাসানুসারে নিজের স্বাধীন প্রচেষ্টা ব্যতীতও তাঁহার চিত্ত ভগবদভিমুখী হয় এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু হওয়া মাত্র তিনি কাম্যকর্ম্মের অতীত ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

অতএব যোগভ্রষ্টদের পক্ষে এ জন্মে লৌকিক গুরুর দরকার নাও হইতে পারে।

কাহারও কাহারও অনুমান যে তিনি সিদ্ধ মহাত্মা সোনাঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; কোন এক ঘটনা উপলক্ষে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে সোনাঠাকুর তাঁহাকে এক মন্ত্র জপের উপদেশ দিয়াছিলেন বটে, তবে তিনি তাহা অল্পদিনই জপ করিয়াছিলেন। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গুরুকরণ হইলে এ ব্যাপার সম্ভব হইত না।

আত্মাই ছিল তাঁহার গুরু, এবং আত্মায় সমাহিত হইয়াই তিনি পরমধামে গমন করিয়াছেন, আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন আশীর্ব্বাদ ও উপদেশ; উহাতে বিশ্বাস রাখিয়া সুপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিলেই আমরা তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবার ও তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হওয়ার যোগ্যতালাভ করিব।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

# শিষ্য সঙ্গে (২)

ছাত্রজীবনে দুই বৎসর কালমাত্র আচার্য্যদেব জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে বাস, তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া উপদেশ শ্রবণ ও ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার জীবনধারা পর্য্যবেক্ষণ করিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। তৎপরে, মাঝে মাঝে তাঁহাকে দর্শন করিতে, তাঁহার সংস্পর্শ হইতে জীবনগঠনোপযোগী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি আহরণ করিতে, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধান করাইয়া লইতে, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি; কিন্তু একসঙ্গে বহুদিন তাঁহার প্রভাবের ভিতরে অবস্থান করিবার সুযোগ আর হয় নাই। কিন্তু ছাত্রজীবনের ঐ দুই বৎসর আমার সর্ব্বাঙ্গীন জীবনসাধনার দিক্ হইতে যে কত মূল্যবান্, চিত্তবিকাশের স্তরে স্তরে ক্রমশঃই তাহা গভীরতর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। অপরকে তৎসম্বন্ধে কোন ধারণা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সেই দুই বৎসরের পরে ২৫ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, অনেক অবান্তর বিষয়ের স্মৃতি স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অবশ্যই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আচার্য্যদেব সম্বন্ধে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের স্মৃতিও যেন সদ্যোদৃষ্ট ব্যাপারের স্মৃতির ন্যায় উজ্জ্বলভাবে চিত্তক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাঁহার অনেক উপদেশ, অনেক ব্যবহার, অনেক কার্য্যকলাপ আমার চিত্তবিকাশের বিভিন্ন স্তরে পুনঃ পুনঃ স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া নূতন নূতন অর্থ ও ভাবসম্পদ লইয়া প্রকাশ

পাইয়াছে, হয়ত বা সেই নূতন অর্থবত্তার প্রতিক্রিয়ায় কিঞ্চিৎ রূপান্তরিতও হইয়া থাকিতে পারে। তাঁহার সেই সময়ের অনেক কথা এখনও কাণে নূতন স্বরে বাজে, অনেক কার্য্যকলাপ এখনও চোখের উপর জীবন্তভাবে ভাসে। তৎসঙ্গে ইহাও স্বীকার্য্য যে, বহু কথার মর্ম্মার্থই মাত্র হৃদয়কে দখল করিয়া আছে, ঠিক তাঁহার মুখের ভাষা পুরোপূরি স্মরণ নাই। এই অবস্থায় যতদূর সম্ভব, তাঁহার সেই কাল সম্বন্ধে আমার স্মৃতিটি অংশতঃ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব। এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমার নিজ জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং যাহা এখন পর্য্যন্ত আমার প্রকাশ করিবার অধিকার বা ইচ্ছা নাই। তদ্‌ব্যতীত, প্রকাশযোগ্য যাহা আছে, তন্মধ্যেও একটি প্রবন্ধে আর কয়টী কথাই বা লেখা যাইবে?

যখন গ্রামের স্কুলে পড়ি, তখন বরিশালের তিন জন আদর্শ পুরুষের নামের সহিত পরিচিত হই—অশ্বিনীকুমার, কালীশচন্দ্র ও জগদীশ। বরিশাল-সম্বন্ধীয় তাৎকালিক বালকোচিত ধারণার সঙ্গে এই তিন জন মহাপুরুষের চিন্তা জড়িত হইয়া গিয়াছিল। এখনও বরিশালের স্মৃতির সঙ্গে এই তিন জনের স্মৃতি অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত হইয়া আছে। আমার শিক্ষকগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের ছাত্র ছিলেন। তদ্ভিন্ন, গ্রামের অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক তাঁহাদের ছাত্র বা ছাত্রকল্প ছিলেন। তাঁহাদের মুখে নানা কথা শুনিয়া শুনিয়া বালসুলভ কল্পনার সাহায্যে বরিশাল, বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয় এবং উক্ত আদর্শ শিক্ষকত্রয় সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লইয়াছিলাম। তাহার ফলে আমার নিজ জেলা (ফরিদপুর) অপেক্ষাও বরিশাল যেন অনেকটা আপন হইয়া পড়িয়াছিল, বরিশালের

আবহাওয়াই যেন সত্য-প্রেম-পবিত্রতা মাখা মনে হইয়াছিল, বরিশালে শিক্ষাদীক্ষা লাভ একটা বিশেষ সৌভাগ্য বলিয়া বোধ জন্মিয়াছিল।

স্কুলজীবনে পড়ার ভিতরে পণ্ডিত কালীশচন্দ্রের 'সংস্কৃতপ্রবেশ ব্যাকরণ' সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ লাভে সহায়ক হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার যে সব কার্য্যকলাপের কথা শুনিয়া প্রাণ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত, তাহার কোন নিদর্শন অবশ্য উহার মধ্যে পাইতাম না। কিন্তু সেই সময়ে,—যৌবনারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থায়—ভক্তবীর অশ্বিনী-কুমারের 'ভক্তিযোগের' সহিত বুদ্ধি ও হৃদয়ের সংযোগ এখনও জীবনের একটা প্রকাণ্ড সৌভাগ্য ও ভগবানের বিশেষ কৃপা বলিয়া অনুভব করি। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের কণ্টকস্বরূপ বহু প্রলোভন ও বিঘ্নবিপত্তি হইতে আত্মরক্ষা করিবার প্রেরণা ও শক্তি এই 'ভক্তিযোগ' হইতে লাভ করিয়াছি। ভক্তিযোগের প্রকাশক-রূপে আচার্য্য জগদীশ একটি ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত তাঁহার আর কোন লেখা পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার তৎকালে দেশব্যাপী জাতীয় আন্দোলনের এক প্রভাবশালী নেতা। তাঁহার কার্য্যকলাপ দেশবিদেশে সর্ব্বত্রই আলোচিত হইত। এই সব আলোচনার মধ্যে কখন কখন অশ্বিনী-কুমারের ব্যক্তিগত জীবনের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনাও কাণে আসিত। কিন্তু দেখিয়া বিস্মিত হইতাম যে, কথাপ্রসঙ্গে যখনই জগদীশবাবুর কথা উঠিত, তখন 'কুকথায় পঞ্চমুখ' ব্যক্তিগণেরও মস্তক শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়িত। 'তাঁর কথা আলাদা' বলিয়া তাঁহাকে যেন সকল প্রকার সমালোচনার ঊর্দ্ধে রাখিয়া দেওয়া হইত। তাহাদের এই প্রকার ভাব দেখিয়া মনে হইত যে, জগদীশ-বাবু এমন একজন মানুষ, যাঁহার চরিত্রে কোন কালিমা স্পর্শ করিতে

পারে না, যাঁহার লোকোত্তর চরিত্রের প্রভাবে বিশ্বনিন্দুকেরা পর্য্যন্ত তাঁহার মধ্যে নিন্দনীয় কিছু খুঁজিয়া পায় না কিংবা কোন নিন্দনীয় কার্য্য তাঁহার উপর আরোপ করিতে সাহস পায় না। তখন ধারণা হইত যে, অশ্বিনীকুমারের বিবৃত ভক্তিযোগের সম্যক্ আদর্শটী সম্ভবতঃ এই জগদীশবাবুর মধ্যেই নিখুঁত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এইরূপ আলোচনা ও চিন্তার ফলে সেই কৈশোর জীবনেই হৃদয়টী তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, অজ্ঞাতসারেই যেন তাঁহার সহিত প্রাণের একটা নিবিড় যোগ স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহার নিকট শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিতে ও তাঁহার আদর্শে জীবনটী গঠন করিতে একটা প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছিল।

১৯০৬ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর দারিদ্র্যের নিগ্রহে সেই আগ্রহ বিসর্জ্জন দিলাম। আহার-বাসস্থানের কিঞ্চিৎ সুবিধার দিকে লক্ষ্য করিয়া ময়মনসিংহ সিটী কলেজে পড়িতে আসিলাম। কিন্তু করুণাময় জীবনদেবতা অন্তরের আকাঙ্ক্ষাটী মঞ্জুর করিয়া আমার অজ্ঞাতসারে সুব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছিলেন। যে সুবিধার দিকে লক্ষ্য করিয়া ময়মনসিংহ আসিয়াছিলাম তাহা মিলিল না। তখনই অপ্রত্যাশিত ভাবে বরিশাল যাওয়ার বন্দোবস্ত হইয়া গেল। অনাত্মীয় বা অপরিচিত লোকের মধ্যে থাকিতে হইলে, বরিশালে থাকাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল,—এ সম্বন্ধে আত্মীয়-স্বজনগণ সম্পূর্ণ একমত ছিলেন, যেহেতু ব্যারামপীড়া হইলে সেখানে বাড়ী অপেক্ষাও অধিক যত্নের সহিত চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা হয় বলিয়া সকলেই জানিতেন। বরিশালবাসী একজন অপরিচিত ভদ্রলোক ময়মনসিংহ হইতে বরিশাল যাইতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গ লইয়া বরিশাল চলিলাম। এইভাবে বরিশাল যাওয়া আমি আমার

ক্ষুদ্র জীবনের একটা বড় ঘটনা বলিয়া স্মরণ করি। আমার সংসারানুগত প্রযত্ন ব্যর্থ করিয়া ভক্তিযোগের একটি উৎসমুখে নিয়া যাওয়ার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবস্থার মধ্যে ভগবানের কতখানি করুণা নিহিত ছিল, তাহা তখন যতটুকু হৃদয়ের আবেগে অনুভব করিয়াছিলাম, এখন বিচার দ্বারা তদপেক্ষা অনেক বেশী অনুভব করি। এই প্রকার কয়েকটী বিশেষ ঘটনার স্মৃতি অনেক সময় মনে করাইয়া দেয়,

'করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়া কোথা নিয়া যায় কাহারে,—
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া এনেছ তোমারি দুয়ারে'।

সেই ভদ্রলোকটির সাহায্যে একটা 'ঠিকাবাসায়' আহার ও বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসে সংস্কৃত পড়াইতেন। আচার্য্যদেব লজিক পড়াইতেন এবং প্রতি রবিবারে বেলা একটার সময় প্রধানতঃ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের জন্যই গীতা ব্যাখ্যা করিতেন। অশ্বিনীবাবু তখন কলেজে পড়াইতেন না। পুরাতন ছাত্রদের নিকট হইতে তাঁহাদের চরিত্র ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ক্রমশঃই নানা কাহিনী শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তাঁহাদের জীবন ও ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু লক্ষ্যও করিতে লাগিলাম। তাঁহাদের সান্নিধ্যলাভ বস্তুতঃই সৌভাগ্য বলিয়া অনুভব করিলাম। ছাত্রগণের প্রতি তাঁহারা যেরূপ নিতান্ত আপনজনের মত স্নেহমমতাযুক্ত ব্যবহার করিতেন, এবং ছাত্রগণ যেরূপ অসঙ্কোচে ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহাদের সহিত মিশিত ও খোলা প্রাণে কথাবার্ত্তা বলিত, তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। এখানে যেন ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই।

প্রায়ই দেখিতাম, পণ্ডিত কালীশচন্দ্র খালি গায়ে, খালি পায়ে, দুই হাতের নীচে ছয় সাতটি ছাত্রের কাঁধ চাপিয়া ধরিয়া, হাসি ও কথার ঢেউ তুলিয়া, শ্মশানখোলা বা কাশীপুরের রাস্তার দিকে চলিয়াছেন, আগে পিছে আরও ছাত্রের বহর চলিয়াছে। ছাত্রদেরও কি আনন্দ! কখন দেখিতাম, হয়ত শ্মশানখোলারই কোন অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার স্থানে এক ছাত্রের উরুর উপর মাথা রাখিয়া, দুই ছাত্রের দুই কাঁধে দুই পা তুলিয়া দিয়া, দুই পার্শ্বে দুই ছাত্রের কাছে হাত দু'খানি টিপিতে দিয়া, তিনি শুইয়া আছেন, চারিদিকে আরও অনেক ছাত্র স্ফূর্ত্তি করিতেছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ উঠিয়া কাহারও নাক মলিয়া, কাহারও কাণ মলিয়া, কাহারও পিঠ চাপড়াইয়া দিতেছেন। এই সব আনন্দের খেলার মধ্যেই কত উপদেশ চলিতেছে, তাঁহার নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা হইতেছে, তাঁহার পুরাতন ছাত্র ও সহকর্ম্মীদের রোগিসেবা প্রভৃতি কার্য্যের প্রশংসা হইতেছে। অশ্বিনীবাবু সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কত বড় একটা বিবাট্ পুরুষ বলিয়া জানিতাম। বাসায় গিয়া দেখিতাম, হয়ত তিনি 'ফরাসে' বসিয়া কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে একটা বড় থালায় তৈল দিয়া মুড়ি খাইতেছেন, মাঝে মাঝে কাড়াকাড়িও করিতেছেন, আর ছাত্র-শিক্ষকের হাসির রোলে সমস্ত বাড়ীটা যেন মুখরিত হইতেছে; সামনে চেয়ারে হয়ত অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, তাঁহাদের সঙ্গেও কথাবার্ত্তা হইতেছে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমান কয়েকজন লোক হয়ত গ্রাম হইতে সহরে আসিয়া 'বাবুকে' একবার শুধু দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকেও আপ্যায়িত করিতেছেন। সকলের সঙ্গেই যেন প্রাণের একটা মাখামাখি
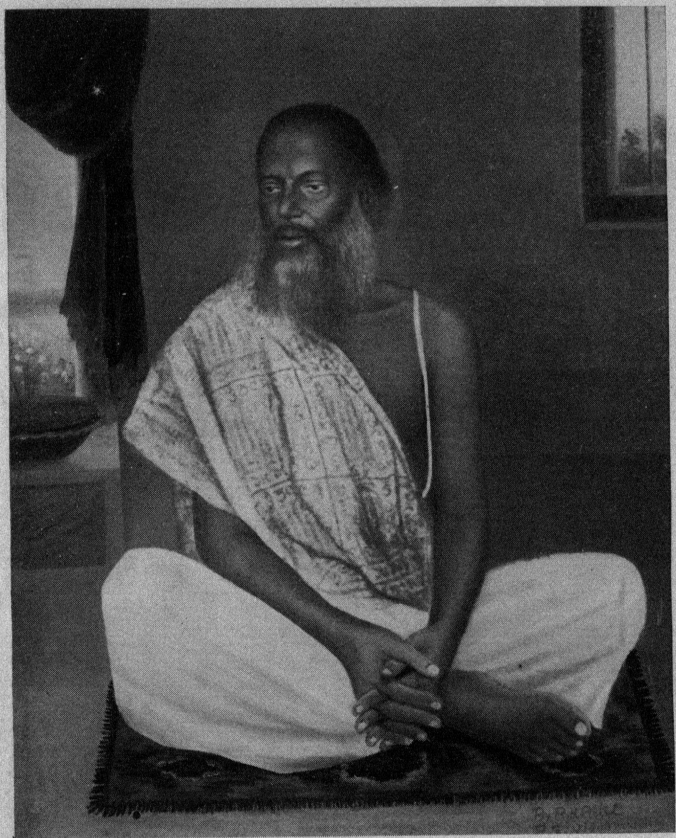
সেবাব্রত কালীশচন্দ্র

প্রকাশ পাইত। তিনি কত বড় লোক, আর আমি কত ক্ষুদ্র,—প্রথম আলাপেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি এই সঙ্কোচ ও ব্যবধান দূর করিয়া দিতেন। এই সব স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গেই গভীর বিষয়ের আলোচনাও হইত। শিক্ষা, ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, ইতিহাস, কিছুই বাদ যাইত না।

ছাত্রদের সঙ্গে এই যে একটা সখ্যভাবের খেলা, এটা ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের আরও অনেক শিক্ষকের মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে লক্ষ্য করিতাম। কিন্তু এতখানি মেলামেশার ভাব আচার্য্য জগদীশের ব্যবহারে দেখিতাম না। তাঁহার সকল ব্যবহারের মধ্যে একটি প্রসন্ন গাম্ভীর্য্য লক্ষিত হইত। তাঁহার সকল কথা, সকল হাবভাব, সকল আচরণের মধ্যে সর্ব্বদাই একটি স্নিগ্ধ মধুর প্রশান্ত সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইত। হাসি ঠাট্টা রসিকতাও তিনি করিতেন না, তাহা নয়, আপন সন্তানের ন্যায় কোলের কাছে টানিয়া নেওয়ার ভাব তাঁহার ব্যবহারেও প্রকাশ পাইত, কিন্তু সবই একটু গাম্ভীর্য্যমাখা দেখা যাইত। কোন ভাবেরই উদ্বেলতা তাঁহার মধ্যে দেখিতাম না। তাঁহার চোখের দিকে চাহিলে অনেক সময় মনে হইত, তিনি যেন দুইটি জগতের মাঝখানে থাকিয়া উভয়েরই সহিত যোগ রক্ষা করিয়া জীবনের সব কর্ম্ম চালাইয়া যাইতেছেন,—একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও একটি অতীন্দ্রিয় জগৎ।

পরবর্ত্তীকালে কোন এক সময় কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাদের মনশ্চক্ষুর উপরে একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন,—সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত বাত্যাবিক্ষুব্ধ উত্তালতরঙ্গময় হিংস্রজন্তুসমাকুল ভীষণ সমুদ্র। তার পরপারে, স্থির নিশ্চল নির্ব্বিকার অনন্ত মহাকাশের কোলে মহামহিমময় সবিতৃদেব বিশ্বের সর্ব্বত্র আপনার কিরণমালা

বিকীরণ করিয়া বিরাজমান। একটি মানুষ সেই সমুদ্রের বেলা-ভূমিতে দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহার দৃষ্টি সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সবিতৃদেবের দিকে অপলকভাবে নিবদ্ধ। সবিতৃদেব আপনার কিরণ-মালা বিস্তার করিয়া সমুদ্রের নানাকারে আকারিত তরঙ্গসমূহকে কত বিচিত্র শোভায় সুসজ্জিত করিতেছেন,—মাঝে মাঝে দৃষ্টি নত করিয়া তিনি তাহা আস্বাদন করিতেছেন। যাহারা সমুদ্র মধ্যে নিপতিত হইয়া তরঙ্গাঘাতে জর্জ্জরিত হইতেছে, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া মাঝে মাঝে তাঁহার চিত্ত ব্যথিত ও করুণাপ্লুত হইতেছে। সমুদ্র তরঙ্গ মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক ভীমবেগে তাঁহার দিকেও অগ্রসর হইয়া কিছুদূরে থাকিতেই যেন অবসাদগ্রস্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, এবং তাঁহার পদ স্পর্শ করিয়াই ফিরিয়া যাইতেছে, তাঁহাকে বিন্দু-মাত্র টলাইতে পারিতেছে না, গ্রাস করা ত দূরের কথা। সমুদ্রের ভিতরে যে কত হিংস্র জন্তুর লড়াই, কত হত্যাকাণ্ড, কত দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, কত আর্ত্তনাদ হাহাকার অনবরত চলিতেছে, তাহা তাঁহার দৃষ্টির মধ্যেই আসিতেছে না। মায়া-সাগরের তটদেশে জ্ঞানী ভক্তগণ ভগবানের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া এইভাবেই অবস্থান করিয়া থাকেন। আচার্য্য জগদীশের নিজের জীবন দেখিয়া যে ভাবটি মনে উদিত হইত, তাহা অনেকটা এই প্রকার। তিনি যেন সংসার সমুদ্রের বেলাভূমিতেই থাকিতেন, ভিতরে কখন ধরা দিতেন না।

ক্রমশঃ মাঝে মাঝে আচার্য্যদেবের বাসায় যাইতে আরম্ভ করিলাম। তাঁহার বাসায় তখন কয়েকখানা ছোট ছোট কুটির মাত্রই ছিল,—গোলপাতার ছাউনি, কাঁচা ভিত্। চারিপার্শ্বেই লম্বা লম্বা গাছ। কতকটা স্যাঁৎসেঁতে ও ছায়ায় ঢাকা। কাঁচা পুলের

উপর দিয়া বাসায় ঢুকিতে, অনভ্যস্ত লোকদের খালে পড়িবার কিছু আশঙ্কাও ছিল। তখনও ছাত্রদিগকে লইয়াই তিনি থাকিতেন। তাঁহার শয়ন গৃহের ছোট বারান্দায় অর্দ্ধাংশে একখানা তক্তাপোষ, অপরার্দ্ধে একখানা অর্দ্ধহস্ত প্রশস্ত বেঞ্চ, ও একখানা সাবেকী আমলের অর্দ্ধভগ্ন বাঁশের মোড়া। এই মোড়াটীই তাঁহার আসন ছিল। আগন্তুকগণ, ছাত্রই হউক কিংবা বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকই হউন, কেহ পার্শ্বস্থ বেঞ্চে, কেহ বা সম্মুখস্থ তক্তাপোষে বসিতেন। ঘরের ভিতরে তাঁহার শুইবার খাটখানা একটু উঁচু ছিল, এবং তাহার সঙ্গে সংলগ্ন নীচু একখানা তক্তাপোষ ও ছোট একটি টেবিল। টেবিলের উপর ২।৪ খানা বই, ২।১ টা ঔষধের শিশি, ইত্যাদি দেখা যাইত। ঘরের অপরার্দ্ধে আর একখানা তক্তাপোষ ছিল। তাঁহার শয্যাসংলগ্ন তক্তাপোষখানি ব্যতীত আর সবগুলিই ছাত্রদের শয়নের জন্য ব্যবহৃত হইত। তিনি যখন ঘরের ভিতরে থাকিতেন তখন তাঁহার বিছানাই বসিবার আসন, আগন্তুকগণ তক্তাপোষ দু'খানি অধিকার করিতেন। আমরা ছাত্রাবস্থায় যতদিন ছিলাম, এইরূপ ব্যবস্থাই দেখিয়াছি, মোড়াটীরও পরিবর্ত্তন হয় নাই, যদিও বেতের বাঁধ অনেকস্থানেই খুলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার গোলপাতার ঘর পরবর্ত্তীকালে ভক্তগণের আগ্রহে ও মহানুভবতায় ইষ্টকালয়ে উন্নীত হওয়ার পরেও আসবাবপত্র প্রায় পূর্ব্ববৎই ছিল। মোড়াটী অতি-মাত্রায় জীর্ণ হইয়া সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য হইলে তাহাকে সরাইয়া একখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক আকারের বেতের মোড়া তাহার স্থান দখল করে, এবং অনেককাল পরে ( সম্ভবতঃ তাঁহার অসুস্থা-বস্থায় ) একখানা আরাম কেদারা আসিয়া তাহাকেও স্থান ভ্রষ্ট করে। তিনি জ্ঞান ও ভাবের রাজ্যে যেমন অসাধারণ পুরুষ

ছিলেন, ভোগ ও ব্যবহারের রাজ্যে তেমনি নিতান্তই সাধারণ ছিলেন।

আচার্য্যদেবের জীবনের আদর্শে এ স্থানের ছাত্রগণের জীবনও একটু নূতনভাবে গড়িয়া উঠিত। বাড়ীটি একটু স্যাঁৎসেঁতে ও বর্ষার দিনে কিছু কাদা হয় বলিয়া, পুলের গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রায় অপর সীমা পর্য্যন্ত, ইট শুরকী দিয়া হাত দেড়েক প্রশস্ত একটি রাস্তা করা হইয়াছিল। জানিলাম, ছাত্রেরাই ইটখোলা হইতে মাথায় করিয়া ইট শুরকী বহিয়া আনিয়া নিজেরাই রাস্তা তৈয়ারী করিয়াছে। বাড়ীর আগাছা তুলিয়া ফেলিয়া ও ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখা ছাত্রদেরই কার্য্য। মাঝে মাঝে ঘর লেপ দেওয়া, ভিত্ খসিয়া পড়িলে মাটি কাটিয়া সমান করা—সবই তাহাদিগকে করিতে হয়। স্বয়ং আচার্য্যদেব ছোট কাপড় পরিয়া, মাথায় গামছা জড়াইয়া, নিজে এই সব কার্য্য করিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। প্রয়োজন হইলে পায়খানা পরিষ্কার করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইত না এবং মেথরের মুখাপেক্ষী হইয়া দুর্গন্ধ ভোগ করিত না। পায়খানার বেড়া দেওয়া, মেরামত করা—এ সব ত নিজেরাই করিত।

কয়েকটি ছাত্রেরই বিশেষ উৎসাহে ও উদ্যোগে একটি ঘরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তির আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণ ভাবে কোন না কোন ছাত্রদ্বারা নিত্যই সেখানে পূজা হইত। প্রতি সন্ধ্যায় ছাত্রগণ সেখানে সমবেত হইয়া কিয়ৎকাল ভজন সঙ্গীত করিত। আচার্য্যদেব কোন কোন দিন তাহাদের মধ্যে আসিয়া এবং কোন কোন দিন স্বীয় আসনে বসিয়াই সেই ভজনে যোগদান করিতেন। মাঝে মাঝে তিনি তাহাদিগকে ধর্ম্মগ্রন্থ

পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন, এবং তৎসঙ্গে তাহাদের জীবনগঠনোপযোগী উপদেশ প্রদান করিতেন। যে কোন ছাত্রের যে কোন দুর্ব্বলতা বা অসঙ্গত ব্যবহার তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিত প্রসঙ্গক্রমে পরোক্ষভাবে তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি সুমিষ্ট ভৎর্সনা করিতেন এবং তাহাদের মনুষ্যোচিত আত্মগৌরববোধ জাগ্রত করিয়া সংশোধন ও উন্নতি সাধনের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত শাসন ও উপদেশ অপেক্ষা এই প্রকার শিক্ষাপ্রদান অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর ফলপ্রদ হইত। এইরূপ এক এক দিনের শিক্ষায় ছাত্রগণ যেন নূতন ভাবের উদ্দীপনা ও নূতন জীবনী-শক্তি লাভ করিত। পূজা ও ভজন তদবধি রীতিমত চলিয়া আসিতেছে। ঠাকুরের মূর্ত্তি এক থাকিলেও আসনের ক্রমশঃ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক দেবমূর্ত্তি ও মহাপুরুষমূর্ত্তি ক্রমশঃ সমাগত হইয়া গৃহখানিকে আদর্শ ভজনালয়ে পরিণত করিয়াছে। ইষ্টকনির্ম্মিত পাকা মন্দির উঠিয়া ঠাকুরের আসন সেখানে পাকাপাকি ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আচার্য্যের সাধনা, শিষ্যদের সানুরাগ সেবা ও ভক্তদের সমাগম অবলম্বন করিয়া ভগবানই ক্রমে ক্রমে আপনাকে এখানে উজ্জ্বলতররূপে প্রকটিত ও দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বাসা সম্পূর্ণরূপেই আশ্রমে পবিণত হইয়াছে। কিন্তু ইহা পরবর্ত্তী সময়ের কথা।

সেই ভজনগৃহে সহরের বহুসংখ্যক ধর্ম্মপিপাসু পুরুষ ও নারী প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে সমবেত হইতেন। সাধারণতঃ সকালে ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত এই ভক্তসম্মিলনের কার্য্য চলিত। গায়ক ভক্তগণ প্রাণের সকল আবেগ ঢালিয়া দিয়া ভগবৎকীর্ত্তন করিতেন। আচার্য্যদেব কখন কখন বিশেষ বিশেষ ভক্তকে বিশেষ

বিশেষ গান গাহিতে আদেশ করিতেন। নানাবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা ও আলোচনা হইত। আচার্য্যদেব গীতা ও ভাগবত এবং কখন বা উপনিষৎ ব্যাখ্যা করিতেন। ভক্তদের হৃদয়ের উদ্বেলতা নানাভাবে প্রকাশ পাইত। পণ্ডিত মহাশয়ের দীর্ঘায়ত চক্ষু দুইটী হইতে বড় বড় ফোঁটা পড়িত, মাঝে মাঝে হুঙ্কার হইতে থাকিত ও শরীর দুলিতে থাকিত। কাহারও নীরবে অশ্রুপাত, কাহারও গাত্রকম্প, কাহারও উচ্চহাস্য—নানা রকমই দেখা যাইত। বলা বাহুল্য, এ সকলের অর্থ তখন কমই বুঝিতাম। কিন্তু একটা ভাবের তরঙ্গ সমস্ত স্থানটীকেই যেন আন্দোলিত করিতেছে, ইহা অনুভব করা যাইত।

আচার্য্যদেবকে দেখিতাম, তিনি একদিকে একটি খুঁটী ঠেস দিয়া নীরবে মুদিত নেত্রে স্থিরভাবে বসিয়া আছেন; কোন উদ্বেলতা নাই, অঙ্গকম্প নাই, আহা উহু হুঙ্কার কিছুই নাই, অনেক সময়েই একখানা হাত কপালে বা মাথায় ঠেকাইয়া নিষ্পন্দ ভাবে উপবিষ্ট। মাঝে মাঝে গানের আদেশ বা পাঠের আদেশ দিতেছেন। নিজের পাঠের সময় উপস্থিত হইলে, চোক মুছিয়া নাক ঝাড়িয়া, আসন একটু বদলাইয়া পুস্তক খুলিতেন। চোখ দুটী তখন নবোদিত অরুণের মত দেখা যাইত, স্বর একটু ভারাক্রান্ত বোধ হইত। ব্যাখ্যার মধ্যে কোন বক্তৃতার ছটা বা স্বরের ঝঙ্কার নাই, কিংবা বাক্যের মধ্যে কোন আবেগ পূরিয়া দেওয়ার চেষ্টা নাই। অথচ প্রত্যেকটী কথা একদিকে যেমন বুদ্ধির সংশয় মিটাইত, অন্যদিকে তেমনি প্রাণের গভীরতম প্রদেশ স্পর্শ করিত। তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে যাহারা অভ্যস্ত হইয়া যাইত, অন্য কাহারও ব্যাখ্যায় তাহাদের আর তেমন

সংশয়চ্ছেদ ও রসাস্বাদন হইত না। ইহা ঐ সব ভক্তদের অনেকের মুখেই শুনিয়াছি। ব্যাপার শেষ হইলে তিনি যখন বাহির হইতেন, তখন মূর্ত্তিটী একটু অভিনব ভাব ধারণ করিত। চোখের চাহনী, মুখের সৌষ্ঠব, হাঁটাচলার ভঙ্গী—সবই একটু নূতন বোধ হইত। সে ভাবগুলি এখনও চোখে ভাসে, কিন্তু তাহা বর্ণনার ভাষা নাই। বোধ হইত যে, তাঁহার মনপ্রাণ যেন কোন্ জগদতীত প্রদেশে বিহার করিতেছে, চোখ যেন কি এক অপূর্ব্ব বস্তু দর্শনের নেশায় বিভোর হইয়া আছে, সামনের জিনিষে যেন তাঁহার নজর পড়িতেছে না, সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া আনন্দ যেন উথলিয়া উঠিতে চাহিতেছে, গলা দিয়া স্বর যেন বাহিরে আসিতে চায় না, অথচ যেটুকু বাহিরে আসে, সেটুকু অতীব মিষ্ট। তাঁহার ভাবের আবেগ তিনি বেশ প্রযত্নের সহিত চাপিয়া রাখিতেন, এবং তাহাতে যেন শরীরের উপর একটু ধাক্কা লাগিত বলিয়াও মনে হইত।

ছাত্রজীবনে এমন একজন মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এই প্রকার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করা একটা বিশেষ সৌভাগ্য। ইহাতে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে চরিত্রের উপর একটি স্থায়ী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক। যে সব পিতা-মাতা বা অভিভাবক ছেলেদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য ততটা লালায়িত ছিলেন না, তাঁহারাও মনে করিতেন যে, জগদীশ-বাবুর কাছে ছেলেকে রাখিতে পারিলে সে মানুষ হইয়া উঠিবে। যে সব ছেলেকে পিতামাতাও সুশাসনে রাখিতে পারিতেন না, জগদীশবাবুর বাসায় থাকিলে তাহারাও সংযত চরিত্র ও পাঠে মনোযোগী হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল। এই কারণে অনেক অভিভাবক সেখানে ছেলে রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইতেন। অথচ

সেখানে স্থানের অল্পতা বশতঃ অল্পসংখ্যক ছাত্রেরই বাসের ব্যবস্থা ছিল। অনেককেই বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইত। আচার্য্যদেবের সন্নিকটে একটু স্থান পাইবার জন্য প্রথম হইতেই আমার লালসা ছিল, কিন্তু প্রস্তাব করিতে সাহস পাই নাই। সেখানকার বিধিব্যবস্থা দেখিয়া লোভ ক্রমশঃই বাড়িতেছিল। ঠিকাবাসায় অসুবিধাও বোধ হইতেছিল। একদিন আমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু আমাকে আচার্য্যদেবের সন্নিধানে নিয়া গিয়া প্রস্তাব করিয়া ফেলিলেন। তখন একটি ছাত্র অসুস্থতা-নিবন্ধন ছুটি নিয়া বাড়ী গিয়াছিল। আচার্য্যদেব আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বিনা আপত্তিতে প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন, এবং ঐ ছাত্রটীর স্থান দখল করিতে বলিলেন, ও জানাইলেন যে সে ফিরিয়া আসিলে কোন রকম একটা বন্দোবস্ত করা যাইবে। আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। এত সহজে এই পবিত্র স্থানে প্রবেশ লাভ হইবে, ইহা কল্পনাই করিতে পারি নাই। বরিশালে থাকিয়া জগদীশবাবুর বাসার ছাত্র হওয়া একটা উচ্চ অধিকারের মধ্যে পরিগণিত ছিল।

এই আশ্রমে স্থান পাওয়ার কিছুদিন পরে একদিন অশ্বিনীবাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন, আমি জগদীশবাবুর বাসায় থাকি, তখন একটা গাঢ় আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন, তুই জগদীশের খাস মহালের প্রজা, আঃ তবে আর ভাবনা কি? 'জগদীশের খাসমহালে' স্থান লাভ করা যে একটা উচ্চ অধিকার, তাহা যেন নূতন ভাবে অনুভূত হইল।

এই আশ্রমবাসী ছাত্রদের সেবাব্রত ও কর্ম্মজীবনের অন্যান্য দিক্ হইতে যে সব বিষয় শিক্ষণীয় ছিল, আমি সে সব বিষয়ে

যথোচিত শিক্ষালাভ করিতে পারি নাই, যেহেতু আমার প্রকৃতি তাহার অনুকূল ছিল না। আমার স্বভাবে কর্ম্মোদ্যমেরও নিতান্ত অভাব ছিল, এবং নিকটবর্ত্তী বন্ধুদের সহিতও বেশী কথাবার্ত্তা ও মেলামেশা করিতে পারিতাম না। আচার্য্যদেব মাঝে মাঝে সে দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন, unsociable বলিয়া মৃদু ভৎর্সনাও করিতেন, 'বাংলা ভাষা ভুলে যাচ্ছনা ত?' বলিয়া কখন কখন শ্লেষও করিতেন, নিজে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ও আদেশ করিয়া কখন কখন ছোটখাট কর্ম্মের মধ্যে টানিয়া নামাইতেও চেষ্টা কবিতেন। আমি আমার ত্রুটিগুলি বেশ অনুভব করিতাম। কিন্তু 'স্বভাবং ত্যক্তুমিচ্ছামি স্বভাবো মাং ন মুঞ্চতি'—কার্য্যক্ষেত্রে আমার এইরূপ অবস্থাই দাঁড়াইত। যাহার ভিতরে তিনি চাঞ্চল্য বেশী দেখিতেন কিংবা বাহ্যিক কাজকর্ম্মের ঝোঁকই বেশী লক্ষ্য করিতেন, তাহাকে তিনি সংযম ও প্রশান্তভাবের অনুশীলন করিতে ও পড়া-শুনায় অধিক মনোযোগী হইতে উপদেশ দিতেন। যাহাকে তিনি অত্যধিক মৃদুভাবাপন্ন, বাহ্যিক কর্ম্মসম্পাদনে নিরুৎসাহ ও প্রয়োজনীয় লৌকিক বিষয়ে উদাসীন দেখিতেন, তাহার ভিতরে তেজ, বীর্য্য, উৎসাহ ও কর্ম্মোদ্যম বৃদ্ধি করিতে যত্নবান্ হইতেন। জ্ঞানার্জ্জনে মনোযোগী হইতে হইবে বলিয়া কেহ পুঁথির কীট হইয়া অন্য সব বিষয়ে অন্ধ বা পঙ্গু হইয়া থাকিবে, ইহা তিনি ইচ্ছা করিতেন না। দেহ মন বুদ্ধি হৃদয়—সকল দিক্ দিয়া পুষ্ট শক্তিশালী ও সজাগ হইয়া উঠিবে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। একদিন দুইটী বিপরীত ভাবাপন্ন ছাত্রকে সম্মুখে আনিয়া বলিলেন দেখ, আমি এই দুইএর মিলন চাই।

আমার স্বভাবের প্রাতিকূল্যবশতঃ আমি আচার্য্যদেবের এই সব

উপদেশ ভক্তিসহকারে গ্রহণ ও আশ্রমবাসীদের কার্য্যকলাপ সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দর্শন করিলেও, সম্যক্‌রূপে তাহা অনুসরণ করিতে পারিতাম না। কাজেই আশ্রমে থাকিয়াও আমি আশ্রমের স্বাভাবিক জীবন-ধারা হইতে একটু যেন বিচ্ছিন্ন থাকিতাম। পক্ষান্তরে আচার্য্যদেবের নিজস্ব ধর্ম্মজীবনটাই ক্রমশঃ আদর্শরূপে আমার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল, তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার চিত্ত ক্রমশঃই আকৃষ্ট হইতে লাগিল, তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচরণগুলি অলক্ষিতে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম, তাঁহার প্রত্যেকটী উপদেশ প্রাণের মধ্যে অমূল্য সম্পদ্‌রূপে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইলাম। তাঁহার সম্মুখে বসিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উপদেশ নেওয়া কমই হইত, কিন্তু তাঁহার কথাবার্ত্তা ও চলাফেরার দিকে সর্ব্বদাই একটা নজর থাকিত। সেই ছাত্রজীবনে তাঁহার নিকট হইতে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, এই অধ্যাপকজীবনে তাহার মূল্য ক্রমশঃ বেশীমাত্রায় উপলব্ধি করিতেছি, এবং এখনও নিজের জীবন গঠনে ও ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদানে তাহার স্মরণ ও সাহায্য গ্রহণ বহুল পরিমাণে আবশ্যক হইতেছে। সেই সময়ের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার উপর কালের প্রভাব কোন প্রকার আবরণ সৃষ্টি না করিয়া বরং তাহাদিগকে উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছে। বাহ্যিক কর্ম্মের দিকেও যে প্রেরণা তখন স্বভাবের বিরুদ্ধতা অতিক্রম করিয়া কার্য্যকরী হইতে পারে নাই, তাহাও যে সূক্ষ্মভাবে জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভবিষ্যৎ জীবনে সে প্রভাব কতক পরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছি।

প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যাবেলা আচার্য্যদেবের নিকটে দু'চার জন শ্রদ্ধালু লোকের সমাগম হইত। তন্মধ্যে বালক, যুবক, বৃদ্ধ, কর্ম্মী,

জ্ঞানী, ভক্ত, সব শ্রেণীর লোকই দেখা যাইত। তিনি কখন বারান্দায় তাঁহার অর্দ্ধভগ্ন মোড়াটীর উপর, কখন বা তাঁহার শয্যার উপর বসিয়া তাহাদের সহিত আলাপ ও আলোচনা করিতেন। সেই সান্ধ্য আসরে নানাজাতীয় আলোচনাই শুনিতে পাইতাম,—ধর্ম্মতত্ত্ব, কর্ম্মনীতি, দেশসেবা, সমাজসেবা, জাতি ও সমাজের অবস্থা ও তাহার প্রতিকার, বিজ্ঞান, দর্শন, ইত্যাদি। বাজে কথাও যে হইত না তাহা নহে। যখন উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে নিরর্থক অবান্তর বিষয়ের আলাপ আরম্ভ হইত, তখন তিনি সাধারণতঃ চুপ করিয়া থাকিতেন, কিংবা তাহারা চিত্তে বেদনা বোধ করিতে পারে এই আশঙ্কায় দু একটা কথায় যোগ দিয়া তাহাদের মনোরঞ্জন করিতেন। তাঁহার ঔদাসীন্য বা অন্যমনস্কতার ভাব দেখিলেই তাহাদের খেয়াল হইত, যে উদ্দেশ্যে এই মহাপুরুষের নিকটে তাহারা সম্মিলিত, তাহা যেন ব্যর্থ হইতেছে বলিয়া অনুভূতি হইত, তাঁহার এত সান্নিধ্যে আসিয়াও তাঁহাকে যেন দূরে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে মনে করিয়া একটু লজ্জাবোধ জন্মিত। তখন তাহারা হয়ত চুপ করিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইত, অথবা পূর্ব্বপ্রসঙ্গ অবলম্বনেই কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে যেন দূর হইতে কাছে টানিয়া আনিত। তিনিও অনেক সময় তাহাদের আলোচ্য বিষয় ধরিয়াই উপদেশ দিতে আরম্ভ করিতেন। কখন কখন অতি সাধারণ লৌকিক বা সাংসারিক কথা হইতে আরম্ভ করিয়া আস্তে আস্তে অতিশয় জটিল রহস্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতেন।

এই সব আলোচনা সাধারণতঃ এমন স্বচ্ছধারায় প্রবাহিত হইত, এমন আড়ম্বরবিহীন স্বাভাবিক কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া অগ্রসর

হইতে থাকিত যে, ইহার মধ্যে আচার্য্যের ন্যায় উচ্চাসন হইতে তত্ত্বোপদেশ দেওয়ার ভাব, পণ্ডিতের ন্যায় শাস্ত্র ব্যাখ্যান ও যুক্তি-জাল বিস্তারের পারিপাট্য, কিংবা শ্রোতাদের বুদ্ধিশক্তির অল্পতার প্রতি কোনরূপ করুণা বা অবজ্ঞার ভাব কখনই প্রকাশ পাইত না। অথচ এক একটি বিষয়েব এই প্রকার সরল ও অকৃত্রিম আলোচনার মধ্যেও কত সময় কত শাস্ত্রের অবতারণা হইত, কত তর্কযুক্তির প্রবাহ চলিত, জড়বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা হইতে কত দৃষ্টান্তের আমদানী হইত, পাশ্চাত্য দর্শন ও প্রাচ্য দর্শনের কত মত মতান্তরের উল্লেখ হইত। কিন্তু তিনি প্রত্যেক কথার মধ্যে এমন একটি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতেন ও এমন একটি মধুর রস ঢালিয়া দিতেন যে, সবটা যেন একটি সরল ও জীবন্ত গল্পের মত শুনাইত। যখন এক একটি আলোচনা সিদ্ধান্তে গিয়া পৌঁছিল, তারপর বিচার করিলে বোঝা যাইত, যে, কত বড় কঠিন সমস্যার সমাধান, কত সূক্ষ্ম জটিল রহস্যের মীমাংসা, কেমন সুন্দর সরস ও সরল-ভাবে বুদ্ধি ও হৃদয়ের দ্বারে তিনি উপস্থিত করিয়াছেন। মনে মনে যতই তাহা রোমন্থন করিবার চেষ্টা করা যাইত, ততই তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের সহিত ব্যাখ্যাননৈপুণ্য ও প্রাণের সরলতার কথা ভাবিয়া মুগ্ধ ও অভিভূত হইতে হইত।

তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিমাণ করিবার শক্তি আমার ছিল না; পরবর্ত্তী কালে ডিগ্রীধারী হইয়া 'বিদ্বান্' আখ্যা লাভ করিয়া এবং ডিগ্রী-লোলুপদের অধ্যাপকপদে অধিষ্ঠিত হইয়াও যখন মাঝে মাঝে তাঁহার দর্শন ও উপদেশ লাভের জন্য গিয়াছি, তখনও সে সামর্থ্য হয় নাই। যখনই গিয়াছি, তখনই তাঁহার মুখে নূতন নূতন তথ্য শ্রবণ করিয়াছি, নূতন নূতন প্রেরণা লাভ করিয়াছি, সতের বৎসর বয়সে নিজেকে তাঁহার

নিকটে যেমন অজ্ঞ বালক বলিয়া বোধ হইয়াছে, চল্লিশ বৎসর বয়সেও প্রায় তদ্রূপই মনে হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা কখনই সম্ভব হয় নাই। সাহিত্য-সেবী, বিজ্ঞানসেবী, দর্শনসেবী, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্ন কর্ম্মাবলম্বী, নানা শ্রেণীর বিশিষ্ট লোকই তাঁহার নিকটে যাইতেন ও আলাপ আলোচনা করিতেন। তাঁহাদের মন্তব্য অনেক সময় কাণে আসিত। শুনিতাম যে, এত বিভিন্ন বিষয়ে এরূপ গভীর জ্ঞান অতি বিরল দৃষ্ট হইয়া থাকে। অথচ, তিনি কোন পুস্তক লিখেন নাই, কোন প্রবন্ধ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই, কোন প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা পর্য্যন্ত করিতেন না। যে সব কর্ম্মে যশ, মান, প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনা আছে, কিংবা কোন বাদ প্রতিবাদের ভিতরে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেই সব কর্ম্ম হইতেই তিনি যেন প্রযত্নপূর্ব্বক দূরে থাকিতেন। যে সব কর্ম্ম প্রকাশ্য সমালোচনার বিষয় হয়, তাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন না। অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থাবস্থায় যখন সাধারণতঃ লোকে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করে—জীবপ্রেমের প্রেরণায় কোন কোন লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি কিছু কিছু যুক্ত হইয়াছিলেন। আমরা যে সময়ে তাঁহার নিকট ছিলাম, তখন তাহাও দেখি নাই, যদিও সকলকেই তিনি কল্যাণকর কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ ও উৎসাহ দিতেন। সাধারণ লৌকিক ব্যবহার যথাসম্ভব কমাইয়া সমস্ত শক্তি তত্ত্বোপলব্ধি ও ভগবদ্‌ভজনে নিয়োজিত করার সাধনাই সম্ভবতঃ তাঁহাকে পুস্তকাদি প্রণয়নেও বিরত করিয়াছিল। আমাদের অবস্থানকালে তাঁহাকে লেখাপড়াও বেশী করিতে দেখি নাই। যতটুকু করিতেন, তাহা শাস্ত্রালোচনা, সাধ্যসাধনতত্ত্বের বিচার ও আস্বাদন।

তাঁহার জ্ঞানতপস্থার কথা অন্যের কাছেও যেমন শুনিয়াছি, তাঁহার নিজ মুখেও কথাপ্রসঙ্গে কিছু কিছু শুনিয়াছি। তিনি আমাদিগকে কখন কখন মুখে মুখে সংস্কৃত শ্লোক শিখাইতেন, এবং কতবার শুনিয়া ঠিকমত আবৃত্তি করিতে পারি, তাহা পরীক্ষা করিতেন। এতদুপলক্ষে তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহার বাল্যকালে তাঁহাদের বাড়ীতে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ঘটক আসিতেন। এবং সেই সব পণ্ডিতের নিকট তিনি নূতন নূতন সংস্কৃত শ্লোক শিখিতেন। এইরূপে শ্লোক মুখস্থ করিতে তিনি এত অভ্যস্ত হইয়াছিলেন যে, একবার শুনিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ পুনরাবৃত্তি করিতে পারিতেন, এবং মোটামুটী অর্থও বলিয়া দিতে পারিতেন। শেষে আর পণ্ডিতেরা তাঁহাকে যেন নূতন শ্লোকই বলিতে পারিতেন না, শোনামাত্র পূর্ব্বপরিচিত শ্লোকের মতই তিনি তাহা আবৃত্তি করিতেন। পরে, শ্লোক রচনায়ও তাঁহার অদ্ভুত দক্ষতা হইয়াছিল। যে কোন বিষয়ে তাঁহাকে শ্লোক রচনা করিয়া দিতে বলিলে, দু'তিন মিনিট মাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া 'মালিনী' 'শার্দ্দুল বিক্রীড়িত' প্রভৃতি কঠিন কঠিন ছন্দে তিনি সুললিত ভাব-গম্ভীর শ্লোক রচনা করিয়া দিতে পারিতেন। সংস্কৃত সাহিত্য দর্শন পুরাণাদিতে তাঁহার অসাধারণ অধিকারের পরিচয় সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যেও পাওয়া যাইত।

ইংরেজী ভাষায়ও তাঁহার দখল অসাধারণ ছিল। তিনি হেড্-মাষ্টার হিসাবে স্কুলের উচ্চতম শ্রেণীতেই ইংরেজী পড়াইতেন। কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষও তাঁহার ইংরেজীর জ্ঞানে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। বি, এ, ক্লাসের ছাত্রগণ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বইগুলির অতি জটিল অংশ নিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেও, তিনি একটু মাত্র দেখিয়া

অতি সরল ভাবে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। খ্যাতনামা ইংরেজ সাহিত্যিকগণের মধ্যে প্রায় সকলের গ্রন্থের সহিতই তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

নিজের সাধন বলে তিনি উদ্ভিদ্ বিদ্যায় (Botany) পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যার কালেও তাঁহার নিকটে দৃষ্টান্ত ছলে উদ্ভিদ্ রাজ্যের অনেক প্রকার গুহ্য রহস্য ও তাহার মধ্যে রসময় ভগবানের বিচিত্র লীলার কথা শুনিতে পাইতাম। তিনি যখন ছাত্রদিগকে লইয়া বাসার আগাছা উৎপাটন ও আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতেন, তখনও মাঝে মাঝে বৃক্ষলতা ফুলফল প্রভৃতির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহ সরস ভাষায় গল্পের আকারে বর্ণন করিয়া একসঙ্গে তাহাদের শ্রমের লাঘব, আনন্দবর্দ্ধন ও জ্ঞানের প্রসারণ করিতেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিতেন যে, এক সময়ে উদ্ভিদ্-জগতের রহস্য ভেদের নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন দিনরাত কেবল এই বিষয়ের পঠন ও চিন্তন। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সম্বন্ধে নানাবিধ পুস্তক অধ্যয়ন করা, নিজে নিজে তদ্বিষয়ে গবেষণা করা, Magnifying glass লইয়া বৃক্ষ গুল্ম তৃণ লতা ফুল ফল মূল পাতা প্রভৃতির ভিতরের সূক্ষ্ম ব্যাপারসমূহ পরীক্ষা করা, গাছপালার মধ্যে উৎসুক দৃষ্টি ও চিন্তাপূর্ণ মন নিয়া ঘুরিয়া বেড়ান,— এ সবই তখন প্রধান কার্য্য ছিল। এই প্রকার তপস্যাদ্বারা তিনি উদ্ভিদ্-জীবন সম্বন্ধে নানা তথ্য আহরণ করিতেন, এবং তৎসঙ্গে নিজের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও ভক্তিরস-ভাবিত-হৃদয় মিলাইয়া ভগবানের প্রেমের লীলা দর্শন করিতেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে (Astronomy) তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইহাও তিনি নিজের স্বাধীন প্রচেষ্টাদ্বারাই অর্জ্জন করিয়া-

ছিলেন। তিনি বি, এ, ক্লাসে Astronomyর অধ্যাপনা করিতেন। কলিকাতায় কোন কোন প্রখ্যাতনামা অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াও ছাত্রেরা অনেকে বলিত যে, Astronomyর জটিল সমস্যাগুলিকে এমন সরস ও সরল করিয়া তুলিতে আব কোথাও দেখা যায় নাই। তিনি যে বিষয়ই ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা আর কেবলমাত্র বুদ্ধির জ্ঞেয় বিষয় থাকিত না, হৃদয়ের সম্ভোগ্য বিষয় হইত। ইহা তাঁহার শিক্ষার একটি বিশেষত্ব ছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞানার্জ্জন সম্বন্ধে তিনি নিজে বলিয়াছেন যে, কোন এক সময় তাঁহার দিন রাত্রি জ্যোতিষের আলোচনাতেই অতিবাহিত হইত। কখন কখন জটিল অঙ্ক লইয়া রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত, এক মুহূর্ত্তও নিদ্রা হইত না। কখন বা অঙ্ক কষিতে কষিতে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতেন, খাতা পেন্সিল বুকের উপরই থাকিত। নিদ্রার ভিতরেও সেই চিন্তার প্রবাহই চলিতে থাকিত। একটি problem নিয়া কখন কখন এক মাস বা ততোধিক সময় অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু নিজের চেষ্টায় তাহার সমাধান না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেন না, বা পরাজয় মানিতেন না। এরূপ অবস্থায় স্বপ্নে কোন মহাপুরুষ আসিয়া সমস্যাটির সমাধান বলিয়া দিয়া গেলেন,—এই প্রকার অভিজ্ঞতা তাঁহার একাধিকবার হইয়াছে। উৎসাহে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সমাধানটি লিখিয়া রাখিতেন। হয়ত প্রণালীবদ্ধভাবে গণনা করিয়া সেই সমাধানটি লাভ করিতে তাঁহার আরো কয়েক দিন কাটিয়া গেল। স্বপ্নলব্ধ সমাধানের সহিত তাঁহার গণনার ফল সম্পূর্ণ মিলিয়া যাওয়াতেই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, মহাপুরুষগণ তত্ত্বপিপাসু সাধকদের প্রতি এইরূপ কৃপা করিয়া থাকেন।

শারীরবিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতিতেও তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সমাজবিধি সম্বন্ধে অনেক খুটীনাটীর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল, এবং সে সকলের মূল উদ্দেশ্য ও তাহাদের বর্ত্তমান আকারের সহিত মূল উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া তিনি যুগোচিত সামাজিক কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেন। জাতির ইতিহাস ও রাষ্ট্রিক সাধনার সহিত তাঁহার বুদ্ধিগত ও প্রাণগত যোগ ছিল। যদিও তিনি কোন সামাজিক বা রাষ্ট্রিক আন্দোলনে কার্য্যতঃ যোগদান করিতেন না, তথাপি তাঁহার বুদ্ধি ও হৃদয় তৎসম্বন্ধে উদাসীন ছিল না। তিনি সব বিষয়ের খবর রাখিতেন এবং সব বিষয় বিচারপূর্ব্বক তত্ত্বনির্ণয় ও ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিতেন। কর্ম্মিগণ অনেক সময় তাঁহাদের সংশয় নিরাস ও পথ নির্দ্দেশের জন্য তাঁহার নিকটে আসিতেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রেরণা শক্তি ও সদুপদেশ লইয়া যাইতেন। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য অগাধ ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি যখন যে বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিতেন, তাহা সেই সময়ের জন্য তাঁহার নিত্য নিরন্তর ধ্যেয় ও বিচার্য্য বিষয় হইত। এইরূপ সাধনার ফলে তত্ত্বসমূহ যেন আপনাআপনি তাঁহার নিষ্পাপ, নির্ম্মল ও নিরাবরণ অন্তঃকরণে আত্মপ্রকাশ করিত। তদ্ব্যতীত, কোন সত্য তিনি শুধু বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিতেন না, কেবলমাত্র বিচারের সাহায্যে বুঝিয়া রাখিলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না, তিনি তাহা হৃদয় দ্বারাও গ্রহণ করিতেন, প্রেমের সাহায্যে প্রত্যেক সত্যের প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করিতেন। সেই হেতু, যতটুকু অধ্যয়ন, পর্য্যবেক্ষণ ও যুক্তিবিচার করিয়া তিনি যতখানি সত্যলাভ করিতেন, তদপেক্ষা অনেক

বেশী পরিশ্রম করিয়াও সাধারণ বিদ্যাসেবীদের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না।

একদিন মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের নিকটে বসিয়া আছি। ছোট বড় সকলেই ত তাঁহার সমবয়সী ছিল। আমার একজন সহপাঠী বন্ধু তাঁহাকে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে আপনার সম্বন্ধে প্রশংসাবাদের সঙ্গে কখন কখন বিরুদ্ধ সমালোচনাও শোনা যায়, কিন্তু জগদীশ-বাবুর সম্বন্ধে প্রশংসাই শুধু শোনা যায়, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা কারও মুখে শোনা যায় না। তিনি প্রথমতঃ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এই কারণে আমি তোমাদের জগদীশবাবুকে বড় একটা কিছু মনে করি না। যে সব বিষয়সম্পর্কে বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়, তার মধ্যে তার আছে কি? বিষয়পশার কিছু নাই, কোন মামলা মোকদ্দমার মধ্যে যাইতে হয় না, কারো সঙ্গে শত্রুতা করিতে হয় না, কোন public workএর মধ্যে ঢুকিল না, দশ রকম লোকের সঙ্গে মিলিয়া দশ রকম মতের বিরোধ ও স্বার্থের সংঘর্ষের মধ্যে পড়িল না, একটা বিয়ে পর্য্যন্ত করিল না, একটা পারিবারিক কলহের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত রাখিল না, চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য করিয়া, ভগবান্ ভগবান্ করিয়া, আর চারিপার্শ্বে ছাত্র ও ভক্ত লইয়া, সহরের এক কোণে জীবন কাটাইয়া দিল। তার কোন কাজের দ্বারা কি public affected হয় যে, public তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবে? এইরূপ কিছুক্ষণ ব্যাজস্তুতি করিয়া, তারপরে একটু গম্ভীর হইয়া অশ্বিনীকুমার বলিলেন, হারে, জগদীশের কথা কি বলিব! এমন লোক সারা দুনিয়ায়,—শুধু এদেশে নয়, সারা দুনিয়ায় ক'টা পাবি? Character and ability এই দুইএর এমন সমাবেশ কোথা পাবি? প্রত্যেকটি কথা এমন জোর দিয়া দৃঢ়তার সঙ্গে

স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত

বলিলেন যে, তাহা কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিল; আমাদের এত কাছে বিদ্যমান এমন সাদাসিদে এই নিতান্ত আপন লোকটি সারা দুনিয়ার মধ্যে এত বড়! অবাক্ হইয়া ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। বাস্তবিক, আমরা আপনাদিগকে অন্তরে অন্তরে এত ক্ষুদ্র বলিয়া অনুভব করি, যে, আমাদের সঙ্গে সমান ভূমিতে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন, বাহ্যিক আচার ব্যবহারে যাঁহাদিগকে আমাদের মতই নিতান্ত সাধারণ দেখিয়া থাকি, যাঁহাদের জীবনযাত্রাব মধ্যে আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রা হইতে অত্যন্ত পৃথক রকমের কোন আড়ম্বর না দেখি,—সেই আড়ম্বর ঐশ্বর্য্যেরই হউক কিংবা দারিদ্র্যেবই হউক, ভোগেরই হউক বা ত্যাগেরই হউক, বাক্যেরই হউক বা কার্য্যেবই হউক,—তাঁহারা যে সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে অসাধারণ মানুষ হইতে পারেন, বাহির হইতে কোন প্রভাবপ্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বা সঙ্ঘ তাহা আমাদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়া না বুঝাইলে আমাদের পক্ষে তাহা ধারণা করা সম্ভব হয় না।

আচার্য্য জগদীশের জ্ঞানের পরিমাণ করা যেমন আমাদেব পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাঁহার প্রেমের গভীরতা ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করাও তেমনি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রপ্রাণ বালকদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। শীতকালে রাত্রি ১টা বা ২টার সময়েও পণ্ডিত কালীশচন্দ্র যদি শুনিতে পাইতেন যে, কোন অসহায় ব্যক্তি তিন চারি মাইল দূরে রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছে এবং তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কোন ব্যবস্থা নাই, অমনি তিনি শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক ২।৪জন ছাত্রকে ঘুম হইতে জাগাইয়া ও পশ্চাতে আসিতে আদেশ করিয়া একাকী ব্যাকুলপ্রাণে সেদিকে ছুটিয়া যাইতেন, এবং সেই রোগীর জন্য

সর্ব্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিতে না পারা পর্য্যন্ত তিনি যেন নিজেই যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেন। তাঁহার জীবপ্রেম এইরূপ কার্য্যে প্রকাশ পাওয়ায় আমরা সহজে ধারণা করিতে পারিতাম। কিন্তু আচার্য্য জগদীশের প্রেম এইপ্রকার কার্য্যে রূপ পরিগ্রহ না করায়, তাঁহার সম্বন্ধে ধারণা করিতে বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। অথচ, সেই পণ্ডিত মহাশয়ের মুখেই শুনিতে পাইতাম যে, জগদীশবাবুর জীবপ্রেমের গভীরতা ও ব্যাপকতা অতুলনীয়। অন্যের দুঃখ তিনি যেমন তাঁহার সারা প্রাণ দিয়া অনুভব করেন, তাহা একমাত্র তাঁহার ন্যায় মহাপ্রাণ উন্নত প্রেমিক ভক্তের পক্ষেই সম্ভব। মহানুভব কর্ম্মযোগী অশ্বিনীকুমার দেশের আপামর জনসাধারণের সর্ব্বপ্রকার অভাব ও ক্লেশ কিরূপ গভারভাবে অনুভব করিতেন, তাহা তাঁহার বাক্য ও কার্য্যের ভিতর দিয়া সর্ব্বদাই আমাদের উপলব্ধির ক্ষেত্র পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিত। তিনি সেই সব অভাব ও ক্লেশের প্রতিকারকল্পে আপনার দৈহিক শক্তি, মানসিক শক্তি, সংগঠনী শক্তি ও আপনার সব প্রভাবপ্রতিপত্তি প্রয়োগ করিতেন বলিয়া তাঁহার ভিতরের অনুভূতি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ অনুমান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু আচার্য্য জগদীশের কর্ম্মবিমুখ দেহখানির বাহ্যাবরণের মধ্যে কত বড় একটা বিশাল প্রাণের তরঙ্গ খেলিত, তাহা স্থূল দৃষ্টিতে কিরূপে দেখা যাইবে? অশ্বিনীকুমারের ন্যায় মহাপ্রাণ ব্যক্তিকেও যখন সেই প্রাণের নিকটে শ্রদ্ধায় নতশির হইতে ও তাহার গুণকীর্ত্তনে রত হইতে দেখা যাইত, তখন তাহার মহিমা কতকটা উপলব্ধিগোচর হইত।

আচার্য্য জগদীশ ছিলেন ভাবরাজ্যের লোক। ভগবান্ তাঁহার দেহখানিও ভাবসাধনারই অনুকূল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি

নিজেও যথোচিত পুরুষকার প্রয়োগ দ্বারা সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গৌরবর্ণ দেহখানিকে কর্ম্মসাধনায় সুপটু করিয়া তোলেন নাই। তাঁহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বভাবতঃ যেন মাখনের ন্যায় কোমল ছিল। করতল ও পদতলের রক্তিম আভা শাস্ত্রবর্ণিত দেবদেবীগণের করকমল ও চরণ-কমলের স্মৃতি জাগাইয়া দিত। তিনি একবার অশ্বিনীকুমারের সহিত পরমহংস রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে গিযাছিলেন। তখন তাঁহার প্রথম যৌবন। পরমহংসদেব নাকি তাঁহাকে দেখিয়াই আনন্দে অশ্বিনীকুমারকে বলিয়াছিলেন যে, অরুণোদয়ের পূর্ব্বে তোলা এই মাখনটুকু কোথা থেকে আন্‌লে? প্রৌঢ় বয়সে দেখিয়াও এই উপমাটিই মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। তাঁহার ভিতর ও বাহির দুইই যেন মাখনসদৃশ ছিল—যেন মানবদেহমনের ছাঁকা সযত্নসঞ্চিত সারভূত বস্তুটুকু, মানবীয় কর্ম্মজগতের সর্ব্বপ্রকার আবিলতা, ঘাত-প্রতিঘাত ও তাপক্লেশের সহিত অসংশ্লিষ্ট থাকিয়া তদুপরি ভাসমান। এই সুগঠিত সুন্দর দেহখানি শীত, রৌদ্র, বর্ষা সহ্য করিতে অপটু ছিল, আয়াসসাধ্য কর্ম্মে ব্যাপৃত হওয়ার উপযোগী ছিল না। ব্যারাম পীড়াও এই শরীরটাকে আলিঙ্গন করিতে কসুর করে নাই। প্রকৃতিজননী যেন তাঁহাকে কোলাহলময় বাহ্যজগৎ হইতে যথাসম্ভব সংগোপন করিয়া, বিবিধ কৌশলে সংসারের বাহ্যকর্ম্মগুলিকে তাঁহার অধিকার হইতে যথাসম্ভব সরাইয়া দিয়া, তাঁহার প্রেমের ধারাটীকে কর্ম্মরাজ্য হইতে ভাবরাজ্যে প্রবাহিত করিয়া, তাঁহার জ্ঞানপ্রেম-সুন্দর জীবনটী অধ্যাত্মজগতেই পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শারীর প্রকৃতির ইঙ্গিত ও আন্তর প্রকৃতির স্বরূপ অনুধাবন করিয়া, বাহ্যকর্ম্মে আপেক্ষিক বিরতি অবলম্বন পূর্ব্বক ভাব-রাজ্যের সাধনাতেই বিশেষরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই

সাধনায় ভগবৎপ্রেমের অঙ্গীভূতভাবে জীবপ্রেমও ক্রমশঃই তাঁহার বিশুদ্ধ অন্তরে উত্তরোত্তর গভীরতা ও ব্যাপকতা লাভ করিতেছিল। জীবমাত্রেরই, তন্মধ্যে মানুষের ও বিশেষতঃ ভারতবাসীর দুঃখ দৈন্য তিনি তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গভীরভাবে অনুভব করিতেন। তাঁহার চোখমুখ হাবভাবের মধ্যে মাঝে মাঝে সেই অনুভূতির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইত। যখন তাঁহার নিকটে বালবিধবাদের কথা উঠিত, বা অনাথ বালকবালিকাদের প্রসঙ্গ উঠিত, কিংবা দেশের অন্নবস্ত্র, শিক্ষাদীক্ষার অভাবের বিষয় আলোচনা হইত, অথবা দেশকর্ম্মীদের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হইত, তখন প্রায়ই তিনি অতিমাত্রায় গাম্ভীর্য্য অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াও স্থির থাকিতে পারিতেন না, ভাব সংগোপন করিতে সমর্থ হইতেন না। প্রত্যেকটী বেদনা তীব্রভাবে তিনি নিজে ভোগ করিতেছেন বলিয়া মনে হইত; অশ্রুধারায় তাহা কতকটা প্রশমিত হইত। তাঁহার এরূপ অবস্থা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

তাঁহার জীবপ্রেম ভগবৎপ্রেমের সহিত যুক্ত থাকায়, ভগবৎ-প্রেমের একটি বিশেষ অঙ্গরূপেই বিকসিত হওয়ায়, ইহার শক্তিও অসাধারণ ছিল। তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলেও, শুভেচ্ছা প্রেরণ করিয়া সমাজের, জাতির ও জীবজগতের কল্যাণ সাধন করিতেন। বাহ্যিক প্রচেষ্টা ব্যতীতও এই প্রকার আধ্যাত্মিক প্রেমশক্তি দ্বারা কতদূর কল্যাণ সাধন করা যায়, তাহা অবশ্য আমাদের ন্যায় স্থূল-দর্শীদের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন। কিন্তু যাঁহাদের ঈষৎপরিমাণেও অধ্যাত্মদৃষ্টি খুলিয়াছে, তাঁহারাই ইহা অনুভব করিতে সমর্থ হন। স্থূলদৃষ্টিতেও ইহা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে, কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় লোকহিতকর কার্য্যে নিয়োজিত লোক সকল তাঁহার নিকটে

আসিয়া, তাঁহার দ্বারা আপনাদের কর্ম্মসম্বন্ধীয় বিবিধ সমস্যার সমাধান করাইয়া লইয়া, তাঁহার উপদেশ পাইয়া, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া, নূতন শক্তি, নূতন কর্ম্মোদ্যম, নূতন আশাভরসা, ও নূতন দৃষ্টি লইয়া সুপ্রসন্ন চিত্তে ফিরিয়া গিয়াছে। অনেক কর্ম্মী এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন যে, তাঁহাকে মাঝে মাঝে কেবলমাত্র দর্শন করিয়া গেলেও কর্ম্মশক্তি বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়, কর্ম্মের সফলতাও অনেক বেশী পরিমাণে লাভ হয়। আচার্য্যদেব এই সব সেবাব্রতীদের প্রতি নানাভাবে আপনার প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। আর্ত্তসেবাপরায়ণ কোন বালক নিকটে আসিলে, তিনি কখন কখন তাহাকে অতি কাছে বসাইয়া স্বহস্তে বাতাস করিতেন। কখন বা নিজ হস্তে এরূপ লোককে তিনি কিছু খাওয়াইতেন। সেবাব্রতীকে সেবা করিয়া তিনি যেন ধন্য হইতেছেন, এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। অতিশয় মনোযোগসহকারে তিনি তাহাদের সেবাকার্য্যের বিবরণ শুনিতেন, এবং প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিতেন। সেবাব্রতের জন্য রামকৃষ্ণমিশনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, এবং তজ্জন্যই বিশেষভাবে স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি এযুগের আদর্শ পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।

একদিন আচার্য্যদেব একান্তে বসিয়া আছেন। চোখ দুটী মুদিত না হইলেও অন্তর্নিবদ্ধ; কোন্ ভাব প্রবাহে ভাসিতেছিলেন, জানি না। এমন সময়ে এক জিজ্ঞাসা লইয়া উপস্থিত হইলাম। মুক্তির প্রসঙ্গ উঠিল। এসম্বন্ধে তাঁহার সেদিনের উপদেশটী হৃদয়ে একটা বড় স্থান দখল করিয়া আছে, যেহেতু তাঁহার নিজের হৃদয়টী সেদিন বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হইল। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—নিজের মুক্তির জন্য এত লালায়িত কেন? তোমার

চারিপার্শ্বে তোমারই মত লক্ষ লক্ষ লোক বন্ধনের যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, তোমারই মত বিচারশক্তিসম্পন্ন লক্ষ লক্ষ লোক উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার অভাবে কামক্রোধ লোভাদির বশীভূত হইয়া অকল্যাণকে কল্যাণ মনে করিয়া, আপাতমনোরম অশেষ দুঃখপ্রদ বিষয়ের দিকে ছুটিয়া বিবিধ তাপে সন্তাপিত হইতেছে, তোমারই মত ব্রহ্মানন্দের অধিকারী অসংখ্য লোক অজ্ঞানে অন্ধ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির লালসায় পরস্পরের সহিত মারামাবি কাড়াকাড়ি করিয়া নানাবিধ দুঃখে জর্জ্জরিত হইতেছে, তোমারই মত সুখদুঃখানুভূতি সম্পন্ন অসংখ্য মানুষ অন্নহীন বস্ত্রহীন গৃহহীন অবস্থায় নানা অত্যাচাব অবিচারে নিপীড়িত হইয়া মনুষ্যত্বেব আদর্শ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে এবং পশুপক্ষীর ন্যায় কোন রকমে প্রাণটুকু রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছে। স্বজাতীয় এই সকল লোককে পশ্চাতে ফেলিয়া, তাহাদিগকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবার কোন ব্যবস্থা না করিয়া, তাহাদের প্রাণের জ্বালায় একটু শান্তিবারি সেচনের চেষ্টা না করিয়া, নিজের নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা কেন? নিজের চিন্তা যে পরিমাণে ছাড়িতে পারিবে, সেই পরিমাণেই নিজের মুক্তি সাধিত হইবে। তোমার প্রাণ এবং অন্যান্য সকলের প্রাণ কি আলাদা? দেহমাত্রই আলাদা। দেহাত্মবোধ অতিক্রম করিয়া প্রাণরাজ্যে প্রবেশ কর, দেখিবে, সকল দেহের মধ্যেই তুমি অবস্থান করিতেছ। বুঝিবে, সকলের সুখদুঃখই তোমার সুখদুঃখ, সকলের বন্ধনই তোমার বন্ধন। জগতের কোন ব্যক্তি অজ্ঞানান্ধ থাকিতে তোমার জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পাদন হইল কৈ? জগতে কোথাও হাহাকার থাকিতে তোমার প্রাণ নিরাবিল আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইবে কিরূপে? জগতের কোন লোক সংসার জ্বালায়

জর্জ্জরিত থাকিতে, তুমি সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইবে কিরূপে? যাঁহারা যথার্থ মহাপ্রাণ, তাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিগত ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার স্বার্থসিদ্ধির বাসনা নিঃশেষ করিয়া দিয়া, বিশ্বপ্রাণের সহিত প্রাণ মিলাইয়া, সকল জীবের কল্যাণ-চিন্তায় রত থাকেন, সকলের মধ্যে শক্তি ও শুভেচ্ছা প্রেরণ করেন, সকলকে দুঃখদৈন্য হইতে মুক্তি প্রদান করিতে উৎসুক হন। জীবের কল্যাণের জন্য মহাপুরুষগণ অনেক সময় অলক্ষিতে বিচরণ করেন বলিয়া শাস্ত্র ও মহাজনের বাক্য আছে। যাঁহারা নিজ দেহে স্থূলভাবে কার্য্য করিতে পারেননা, তাঁহারা অনেক সময় অন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের দেহের ভিতর দিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে কথা আছে যে, তিনি নিজের মুক্তির জন্য গৃহত্যাগ করেন নাই, তাঁহার সাধনা ও তত্ত্বজ্ঞানলাভ নিজের জন্য নয়। তিনি সকল মানবকে জরা ব্যাধি মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং তাহার উপায় আবিষ্কার করিয়া সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে তাহা প্রচার করিয়াছেন। জগতে একটি লোকও বন্ধনগ্রস্ত ও দুঃখ-পীড়িত থাকিতে, কাহারও আত্যন্তিক নির্ব্বাণ হইতে পারেনা, এরূপ মতও তিনিই প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন।

এই ভাবের কথা বলিতে বলিতে আচার্য্যদেবের হৃদয়ের মধ্যে যে প্রেমের তরঙ্গ খেলিতেছিল, তাহা তাঁহার ভাষার স্রোত, চোখের দীপ্তি ও ছল্ ছল্ অবস্থা প্রভৃতির ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তিনি যেন সত্য সত্যই তখন বিশ্বের সকল লোকের দুঃখদৈন্য নিজের ভিতরে অনুভব করিয়া, তাহাদের মুক্তির জন্য নিজের প্রাণটী ঢালিয়া দিতেছিলেন, নিজের সাধনলব্ধ সমস্ত শক্তি তাহাদের জ্বালা নিবারণের জন্য প্রয়োগ করিতেছিলেন।

শ্রীমদ্ ভাগবতে ভাগবতশিরোমণি প্রহ্লাদ ভগবান্ নৃসিংহদেবের চরণে যে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন তাহা তিনি মাঝে মাঝে শুনাইতেন। প্রহ্লাদ বলিতেছেন—

নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যা-
স্তদ্বীর্য্যগায়ন-মহামৃত-মগ্নচিত্তঃ।
শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্॥
প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামাঃ
মৌনং চরন্তি বিপিনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥

হে পরমাত্মন্! দুস্তর ভববৈতরণী পার হওয়ার জন্য আমি উদ্বিগ্ন নই; কারণ এখানেও তোমার মাহাত্ম্যকীর্ত্তনরূপ মহামৃতাস্বাদনে আমার চিত্ত মগ্ন আছে। যাহাদের চিত্ত সেই অমৃতাস্বাদনে বিমুখ এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সুখ রূপ মায়ামরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া যাহারা কেবল নানাপ্রকার ভারবহনের ক্লেশই ভোগ করিতেছে, সেই সব মূঢ়দের জন্যই আমার কষ্ট। হে দেব! মুনিগণ প্রায়ই নিজ নিজ মুক্তির কামনায় মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক বিজন বনে সাধন-ভজন করেন, তাঁহারা পরার্থনিষ্ঠ নন্। আমি এই সব দীন কৃপার্হ ভাই সকলকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী মুক্তি নিতে ইচ্ছুক নই। আর সংসারচক্রে ভ্রাম্যমান এই সকল কৃপণদের উদ্ধারের নিমিত্ত তুমি ব্যতীত অন্য কেহ ত আশ্রয়নীয় নাই।

এই প্রকারে প্রহ্লাদ দীনদুঃখী ভগবদ্‌বিমুখ লোক সকলের ক্লেশ নিজে অনুভব করিয়া ভগবানের নিকট তাহাদের কল্যাণের

জন্যই প্রার্থনা করিতেন, নিজের মুক্তির জন্য নয়। ইহাই যথার্থ ভক্তের আদর্শ। আচার্য্য জগদীশও এই আদর্শটী আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন। তিনি ছাত্রদিগকে একটি প্রার্থনার মন্ত্র শিখাইতেন—

স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী॥

বিশ্বের কল্যাণ হউক। খল ব্যক্তিদের চিত্ত প্রসন্ন হউক। প্রাণিগণ সকলে অন্তরে অন্তরে পরস্পরের মঙ্গল ধ্যান করুক। যাহা যথার্থ ভদ্র, মন তাহারই ভজনা করুক। আর আমাদের হৃদয় নিষ্কামভাবে (অন্য কোন আশঙ্কা বা উদ্দেশ্য না রাখিয়া) ভগবানে আবিষ্ট হউক। তিনি বলিতেন যে, এই প্রার্থনার ভাবটী জাতির প্রত্যেক বালক বালিকা ও যুবক যুবতীর চিত্তে গাঁথিয়া দিতে পারিলে দেশের যথার্থ মঙ্গল হয়।

আমার মনে হয়, আচার্য্যদেব অন্তররাজ্যে প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, শেষ জীবনে—বাহ্যিক কর্ম্মশক্তি শেষ হইয়া আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে লোকশিক্ষার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মের মধ্যে তাহার একটু রূপ ফুটাইতে চাহিয়াছিলেন। এই হেতু তিনি স্থানীয় রামকৃষ্ণমিশনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, পতিতা ভগ্নীদের দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবনের উৎকর্ষসাধনেও কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়াছিলেন, বালবিধবাদের জীবনের শান্তি ও উন্নতি বিধানের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, নিজের আশ্রমে ধর্ম্মশিক্ষার সঙ্গে চরকা ও অন্য কিছু কিছু কুটীর শিল্পের আমদানী করিয়াছিলেন, এবং আরও

কোন কোন সমাজহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত আপনাকে যুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এসকলই তাঁহার লোকশিক্ষার কিঞ্চিৎ অঙ্গমাত্র, তাঁহার লোকপ্রেমের কিঞ্চিৎ বাহ্যপ্রকাশ মাত্র। ইহা দ্বারা তাঁহার অনুভূতির ধারণা করা অসম্ভব।

আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ হইতে আমি যতটুকু উপদেশ লাভের সুযোগ পাইয়াছি, তাহাতে আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে, তাঁহার সকল উপদেশের ভিত্তি ছিল 'গীতা' ও 'ভাগবত'। গীতা ও ভাগবতের শিক্ষা তাঁহার নিজের সাধনজীবনেরও নিয়ামক ছিল। গীতা ও ভাগবত ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বলিয়া তিনি উল্লেখ করিতেন। তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন যে, আমার ঘরে যদি আগুণ লাগে, এবং এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে একটিমাত্র জিনিষ লইয়া আমি বাহির হইতে পারি, তবে আমি গীতাখানি লইয়া বাহির হই এবং মনে করি যে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ রক্ষিত হইল, আর যদি দুইটি জিনিষ লইয়া বাহির হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে গীতা ও ভাগবত, এই দুইটি সম্পত্তি লইয়া আত্মরক্ষা করি। গীতা ও ভাগবতের সম্বন্ধ নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন যে, গীতায় যেন বিশ্বগুরু ভগবান্ উচ্চ মঞ্চ হইতে বা পাহাড়ের উপর হইতে নিম্ন ভূমিস্থিত আর্ত্ত ও জিজ্ঞাসু আমাদিগকে গম্ভীর নিনাদে অথচ মধুর স্বরে উপদেশ করিতেছেন এবং আমাদিগকে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন ও তুলিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ভাগবতে তিনিই সম্মোহন মূর্ত্তিতে আমাদের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছেন, আমাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, খেলা ধূলা গল্প গুজব করিয়া, বিচিত্র রস-মাধুর্য্যে সকল শ্রেণীর লোকের আস্বাদ্য করিয়া, সেই সব তত্ত্বই

আমাদের হৃদয়ের গভীর প্রদেশে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিতেছেন। ভাগবতে জ্ঞান ও আনন্দ মিলিতভাবে আমাদের ভিতরে প্রবেশ করে এবং বুদ্ধি ও হৃদয়কে একীভূত করিয়া ফেলে। ভাগবত পাঠে জ্ঞান আনন্দদ্বারা জীর্ণ হইয়া জীবনের অঙ্গীভূত হয়, এবং আনন্দ জ্ঞানদ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া সমুজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়। গীতায় ভগবান্ উদার মহান্ করুণাময় বিশ্ববিধাতা ও বিশ্বগুরু, ভাগবতে তিনি তৎসঙ্গে সুন্দর মধুর প্রেমঘনমূর্ত্তি দরদী সখা। তবে ভাগবতের ভাষাটি এমন যে, প্রত্যেকটি কথা চিবাইয়া চিবাইয়া আস্তে আস্তে রসাস্বাদন করিতে হয়। শুধু বুদ্ধিদ্বারা বুঝিলে ভাগবত অধ্যয়ন হয় না, হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে হয়।

বি, এ, পরীক্ষার পরে কিছুদিন তীর্থ ভ্রমণ, সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া যখন বরিশালে আচার্য্যদেবের নিকটে ফিরিয়া যাই, তখন একদিন প্রসঙ্গক্রমে সাংখ্যপন্থী একজন বহুশাস্ত্রবিৎ মনীষী সাধুর উক্তি ও যুক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া গীতার কোন কোন মত সম্বন্ধে সমালোচনা করিতেছিলাম। আচার্য্যদেব নানা প্রকার যুক্তিতর্ক দ্বারা সেই সমালোচনার অন্যায্যতা প্রতিপাদন করিলেন। তৎপরে, একটু অতিমাত্রায় গম্ভীর হইয়া বলিলেন, যে, নানা স্থান ঘুরিয়া বড় বড় সাধুমহাত্মার সঙ্গ করিয়া যত কিছুই লাভ কর না কেন, যদি কোন ক্রমে গীতার ঠাকুরটিকে হারাইয়া ফেল, তবে মোটের উপর বড় একটা লোকসানই হইয়াছে, বলিব। সকল শাস্ত্রের উপরে গীতার আসন।

আচার্য্যদেবের সহিত পরিচয় ব্যক্তিগতভাবে ঘনীভূত হওয়ার পূর্ব্বেই গীতাক্লাসে তাঁহার মুখ হইতে ভগবদ্‌বাক্যের আস্বাদন কিছু কিছু পাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ ও

হৃদয়স্পর্শী ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া গীতার বাণী যেন জীবন্ত হইয়া চিন্তাধারা ও ভাবধারার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ক্রমশঃ তাঁহার বহির্জ্জীবনের ও অন্তর্জ্জীবনের পরিচয় লাভের যতই সুযোগ হইতে লাগিল, গীতা যেন মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ততই মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দিতে লাগিল। বর্ত্তমানে এই ২৫।২৬ বৎসর পরেও গীতা অধ্যয়নের সময় তাঁহার সেই সময়ের অনেক কথা—দর্শন শাস্ত্রের সূত্রের মত অনেক ছোটখাট বাণী—কাণে বাজিতে থাকে, চক্ষুর অনুপম দৃষ্টি, মুখমণ্ডলের ভাব ও দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সঞ্চালন চোখের সামনে ভাসিতে থাকে, তাঁহার কর্ম্মবাহুল্যবিহীন দৈনন্দিন জীবনের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য স্মৃতি-পথে উদিত হয়। এক একটি শব্দের ভিতর হইতে তিনি কত রহস্য উদ্ঘাটন করিতেন। শুনিয়া যেমন আনন্দ হইত, তেমনি বিস্ময় হইত, তেমনি ভাবের উদ্দীপনা আসিত। মাঝে মাঝে বলিতেন, এই যে 'এব' শব্দটি, এর দাম লাখ টাকা, এই বলিয়া ইহার তাৎপর্য্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেন। আবার, শ্লোকের পর শ্লোক কি রকম স্বাভাবিক ভাব প্রবাহে আপনা আপনি উদিত হয়, তাহা দেখাইয়া দিয়া গীতার শব্দবিন্যাস, বাক্যবিন্যাস ও শ্লোকবিন্যাসের অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বুঝাইয়া দিতেন। গীতা যে একাধারে রসাল সাহিত্য, সুযুক্তিপূর্ণ দর্শন, সার্ব্বজনীন ধর্ম্মশাস্ত্র—ইহা আচার্য্য জগদীশের ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিত। শ্রীধর স্বামীর টীকার প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। শ্রীধরের ব্যাখ্যার বিপরীত কোন ব্যাখ্যা তিনি গ্রহণীয় মনে করিতেন না। শ্রীধর তাঁহার সংক্ষিপ্ত টীকার মধ্যে ছোট ছোট এক একটি পদ বা একটি বাক্য সংযোজনা করিয়া দিয়া যেরূপ এক একটি গভীর দার্শনিক রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন

করিয়াছেন, কিংবা এক একটি রসের খনির সন্ধান দিয়াছেন, তাহা কি আর কোথাও পাওয়া যায়?—এইরূপে প্রসঙ্গ ক্রমে প্রায়ই শ্রীধরের গুণগান করিতেন। পক্ষান্তরে, আমরা অনুভব করিতাম যে, অতি সাধারণ পরিচিত কথাও যখন তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইত, তখন যেন তাহার ভিতরে নূতন অর্থ, নূতন ভাব, নূতন মাধুর্য্য পাওয়া যাইত।

একটি রাত্রির কথা আমার পক্ষে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। সরস্বতী পূজা। ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় ছাত্রগণের উৎসাহে ও উদ্যোগে মহাসমারোহে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর অর্চ্চনা হয়। ধর্ম্মালোচনা, কীর্ত্তন, দরিদ্রনারায়ণ সেবা প্রভৃতি সাত্ত্বিক অঙ্গেরই সেখানে প্রাধান্য। ইহার কয়েকদিন পূর্ব্বে বেলুড় মঠের শ্রীমৎ প্রেমানন্দ স্বামী, শ্রীমৎ নির্ম্মলানন্দ স্বামী ও শ্রীমৎ অম্বিকানন্দ স্বামী বরিশালে আসিয়াছেন। প্রেমঘনমূর্ত্তি প্রেমানন্দজীর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়া প্রেমধারা বিগলিত হইয়া দর্শক মাত্রেরই হৃদয় প্লাবিত করিত বলিয়া বোধ হইত। তাঁহাকে দেখিলেই আকৃষ্ট হইতে হইত। শ্রীমৎ নির্ম্মলানন্দজী বক্তৃতা ও উপদেশ দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিতেন। যুবক অম্বিকানন্দের সঙ্গীতে আনন্দের তরঙ্গ খেলিত। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় আনা হইল। শ্রীমৎ নির্ম্মলানন্দ স্বামী কিছুকাল বক্তৃতা করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্বান করিলেন। প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ও ভক্তিভাবোদ্দীপক উপদেশে সকলেই আমোদিত ও উপকৃত হইলেন। আচার্য্যদেবও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গৃহে ফিরিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনি আমাকে ডাকিলেন। ডাকিবার ভাবে একটু বিস্মিত হইলাম। তিনি সাধারণ ভাবে

কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ বলিলেন যে, তুমি ত একটি প্রশ্নও করিলে না, ভাবিয়াছিলাম তুমি অনেক প্রশ্ন করিবে। আমি ধীরে ধীরে উত্তর করিলাম যে, কোন জিজ্ঞাসা মনে জাগে নাই, অন্য কাহারও নিকট প্রশ্ন করিবার আগ্রহও বড় একটা হয় না। বিশেষতঃ এতদিন এখানে যাহা শুনিয়া আসিতেছি, আজকের উপদেশের মধ্যে তদপেক্ষা নূতন কিছু পাইলাম বলিয়া মনে হইল না। আচার্য্যদেব বলিলেন যে, নূতন কিছু শুনিবার কথা বলিতেছি না, ইঁহারা সন্ন্যাসী, ইঁহাদের 'চাপরাস' আছে, সাধ্যসাধন বিষয়ে খুব দৃঢ়তার সহিত উপদেশ দিবার অধিকার ইঁহাদের আছে, ইঁহাদের কথায় জোর পাওয়া যায়; এখানে ত শোন বইয়ের কথা।

এই জাতীয় বিনয় আচার্য্যদেবের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল, এবং ইহা তাঁহার কথায় ও ব্যবহারে সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইত। তিনি যে মুখেই এই প্রকার বলিতেন, তাহা নহে; এইরূপ বিনয় তাঁহার প্রাণেরই একটি বিশেষ সম্পদ ও সৌন্দর্য্য ছিল। তিনি যেন আমাদের মতই একজন সাধারণ লোক, দশ জনেরই একজন, বয়স কিছু বেশী ও দুচারিখানা বই বেশী পড়িয়াছেন বলিয়া একটু উপরের ক্লাসের ছাত্র মাত্র,—এইরূপই তিনি নিজেকে মনে করিতেন বলিয়া তাঁহার কথার ভাবে ও ব্যবহারে প্রকাশ পাইত। বহু লোকের ধর্ম্মোপদেষ্টা হইলেও তিনি যেন ধর্ম্মজগতে শিশুই ছিলেন। তিনি কখন কখন বলিতেন, যে, আমি ছাত্রদিগকে নিয়া থাকি ও তাহাদের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করি, ইহার কারণ এই যে, ইহাদের সংসর্গে আমাকে বাধ্য হইয়া ভাল থাকিতে হয়, ইহারা আমাকে যে চোখে দেখে, তদনুরূপ হইবার জন্য আমাকে বাধ্য হইয়া প্রযত্ন করিতে হয়, আমার দুর্ব্বলতাগুলিকে চাপিয়া রাখিবার জন্য সজাগ থাকিতে হয়। এই ভাবের কথা তাঁহার

মুখে শুনিয়া একদিন একজন পণ্ডিত সন্ন্যাসী আমাদের সম্মুখে তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যাভাষণের অভিযোগ আনিয়া তাঁহাকে জব্দ করিয়াছিলেন। আমরা কোন দুর্ব্বলতার কথা জানাইয়া উপদেশ চাহিলে, তিনি অনেক সময় এমন ভাবে সেই সব কথা গ্রহণ করিতেন, যেন তাঁহারই দুর্ব্বলতার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে, এবং উপদেশও এমন ভাবে দিতেন, যেন নিজের দোষ সংশোধনেরই উপায় বাক্যের সাহায্যে চিন্তা করিতেছেন।

পক্ষান্তরে তাঁহাকে যখন লোকে সাধু, মহাপুরুষ ইত্যাদি আখ্যা দিয়া নানা ভাবে তাঁহার প্রশংসাবাদ করিত, তিনি সাধারণতঃ চুপ করিয়াই শুনিতেন, প্রফুল্লও হইতেন না, 'দাসানুদাসের' ভাব দেখাইয়া বিনয়মণ্ডিত প্রতিবাদও করিতেন না। সময়ান্তরে তাঁহার মুখে লোকের প্রশংসা ও স্তুতিবাদ কি ভাবে গ্রহণ করিতে হয় তাহা এইরূপ শুনিয়াছি। লোকে যখন নানা প্রকার বিশেষণ লাগাইয়া আকাশে তোলে, তখন প্রতিবাদ না করিয়া কি ভাবে তাহা গ্রহণ করিতে হয় জান? মনে মনে বুঝিবে ও স্মরণ রাখিবে যে, তোমার এই সব শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণ তোমাকে ঐরূপ দেখিতে চান, তুমি ঐরূপ প্রশংসাযোগ্য হইলে তাঁহারা সুখী হন, তাঁহারা স্তুতিবাদের ছলে তোমার জীবনের আদর্শটি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দেন। তাঁহারা তোমাকে যত বড় দেখিতে চান, তার তুলনায় তুমি কত ছোট, তা'ত নিজে জান। তাহা স্মরণ করিয়া সেই আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত করিতে দৃঢ় সংকল্প হইবে, এবং তোমার ঐ সব বন্ধুরা তোমার আদর্শ উজ্জ্বল, সংকল্প অটুট ও জীবন সার্থক করিবার সহায় বলিয়া তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে ও মনে মনে তাহাদিগকে প্রণাম করিবে।

কখন কখন আরো গভীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তিনি নিন্দা প্রশংসা গ্রহণ করিতে শিক্ষা দিতেন। ভগবান্ আমাদিগকে নানা ভাবে কৃপা করেন। নিন্দা প্রশংসা তাঁহার কৃপারই এক প্রকার নিদর্শন। প্রশংসাকারীরূপে তিনিই আমাদিগকে জীবনের আদর্শ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, সেই আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য উৎসাহ দিতেছেন, এবং আমাদের আত্মশক্তির উপর শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিতেছেন। আবার নিন্দাকারীরূপে তিনিই আমাদের দুর্ব্বলতা তীব্রভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছেন, এবং আমাদের কত রকমে পতনের সম্ভাবনা আছে, তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন। প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী, উভয়ের মধ্যে ভগবান্‌কে দেখিয়া, উভয়ের মুখ হইতে ভগবানের ইঙ্গিত বুঝিয়া লইয়া, মনে মনে তাঁহার করুণার জন্য কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণাম করিবে। কিন্তু নিজে কাহারও নিন্দা করিবে না, বাজে প্রশংসাও করিবে না। তবে মহৎ চরিত্র আলোচনা করিবে, যাহার ভিতরে যেটুকু ভাল দেখ, তাহা চিন্তা করিবে। তাহাতে নিজের ভিতরে মহদ্‌ভাব আসিবে। লোকের দোষ আলোচনা করিলে, নিজের মনই দূষিত হয়। এইসব উপদেশের তাৎপর্য্য আচার্য্যদেবের ব্যবহারে বেশ প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম। তাঁহার নিন্দা কখন শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, প্রশংসায় তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখি নাই। তিনি নিজে কাহারও নিন্দা করিতেন না, প্রশংসাও সাধারণতঃ সদালোচনা সম্পর্কে প্রয়োজনানুসারেই করিতেন, এবং কোন বিশেষ আদর্শের দিকে শ্রোতাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ও তদনুবর্ত্তনে তাহাদের উৎসাহ-বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যেই করিতেন। নিরর্থক স্তোকবাক্য বা স্তুতিবাদ তাঁহাকে করিতে শুনি নাই।

এখন সেই রাত্রির কথা বলি। তিনি নিজে শুধু পুঁথির কথাই বলেন, এইরূপ বিনয় প্রকাশ করিয়া স্বামীজির উপদেশ সমূহের যেন পুনরাবৃত্তি আরম্ভ করিলেন। স্বামীজির এক একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তিনি গীতার বাক্য উল্লেখ পূর্ব্বক তাহার সমর্থন করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিলেন যে দেখ, আজ যত বিষয় প্রশ্নোত্তর হইল, সব বিষয়ের কেমন সুন্দর মীমাংসা গীতাতেই আছে; এমন কোন সমস্যা নাই, যাহার সমাধান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গীতার মধ্যে পাওয়া যায় না। গীতা যে সকল শাস্ত্রের সার ও বিশ্ব মানবের জীবন নিয়ন্ত্রণে সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় গ্রন্থ, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। গীতার ঐ সব শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাকল্পে ক্রমশঃ স্বাভাবিক ভাবে শ্রীমদ্-ভাগবতের তদনুরূপ শ্লোক ও উপাখ্যানসমূহের অবতারণা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখাইতে লাগিলেন যে, গীতায় যে সব সাধ্য-সাধন রহস্য সংক্ষেপে জমাট বাঁধিয়া গম্ভীর ভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাই কত মোলায়েম করিয়া, কত দৃষ্টান্ত দিয়া, কত বিচিত্র রসের ও ভাবের সুবিমল ধারা প্রবাহমান করিয়া, শ্রীমদ্ ভাগবত আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছে, এবং আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয়কে যেন অবগাহন ও সন্তরণ করিবার সুবিধা দিতেছে। এই সব বলিতে বলিতে তাঁহারও যেন ভাবের বন্যা ছুটিল। সেখানে যেন ভাগবতেরই একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হইল। ভক্তি-প্রেমে তরঙ্গায়িত হইয়া তাঁহার ব্যাখ্যানের প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। কেহ তাঁহার কথা শ্রবণ ও গ্রহণ করিতেছে কিনা, সে দিকেও যেন লক্ষ্য নাই। শ্রোতা যেন উপলক্ষ মাত্র। একটির পর একটি হৃৎকর্ণরসায়ন শ্লোক ও লীলার নিগূঢ় রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত

হইতে লাগিল। ভাগবতের চিন্তাধারা, ভাবধারা ও সাধনধারার সঙ্গে একটা সাধারণ পরিচয় করাইয়া দিয়া, অবশেষে বলিলেন, এসব কথার অবতারণা কেন হইল বুঝিলে? নারদের পূর্ব্বজন্মের উপাখ্যান মনে পড়ে? একবার মাত্র সেই দাসীপুত্রকে আপনার দিব্যরূপে দর্শন দিয়া ভগবান্ তাঁহাকে জানাইলেন যে, এই একবার যে তোমাকে দর্শন দিলাম, ইহার উদ্দেশ্য আমার (ভগবানের) প্রতি তোমার কাম (অনুরাগ) বৃদ্ধি করা। সেইরূপ তোমাকে যে এইরাত্রে এত ভাগবত শুনান হইল, ইহা ভাগবতের প্রতি তোমার কাম (অর্থাৎ অনুরাগ) জন্মাইবার জন্য। মনে ভাবিওনা যে শুধু গীতা পড়িলেই তোমার কাজ শেষ হইল; গীতার পরে ভাগবতের আস্বাদন চাই। বিদ্যাদেবীর আরাধনার দিবসে নিশীথ রাত্রে বিদ্যামন্দিরের একটি নূতন কক্ষ আচার্য্যদেব আমার নিকট খুলিয়া দিলেন। ভাগবতশাস্ত্রে দীক্ষালাভ হইল। তাঁহার আশীর্ব্বাদে গীতা ও ভাগবত আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই।

১৯০৮ সনের চৈত্র মাসের শেষভাগে আচার্য্যদেব চন্দ্রনাথ, আদিনাথ প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিবার মানসে যাত্রা করেন। দুই সপ্তাহের মধ্যেই ফিরিবার কথা। শ্রীশবাবু, সূর্য্যবাবু প্রমুখ কয়েকজন সঙ্গী ছিলেন। আমার এফ্, এ, পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। কাজেই সুযোগ পাইয়া সঙ্গ ধরিলাম। দিন কয়েকটি আমার নিকট চির-স্মরণীয় রহিয়াছে। আচার্য্যদেবকে যেন সেই কয়েকটি দিন নূতনরূপে পাইয়াছিলাম, এবং সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রার সার্থকতা সে বারই প্রথম বিশেষভাবে বুঝিয়াছিলাম। চলাফেরার অভ্যাস ত আচার্য্যদেবের কমই ছিল। নূতন নূতন অবস্থার সংস্পর্শে, নূতন নূতন দৃশ্য দর্শনে, নূতন নূতন ভাবোদ্দীপনায়, তাঁহার আনন্দোল্লাসের তরঙ্গ

যেন তাঁহাকে বেশ একটু আন্দোলিত করিয়াছিল। তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য যেন একটু শিথিল হইয়া অন্তরের আস্বাদনকে বাহিরে প্রকাশিত হইবার জন্য কিছু সুযোগ দিয়াছিল। মাঝে মাঝে এক আধটুকু বালক ভাবও তাঁহার আচরণে প্রকাশ পাইত।

ষ্টীমার নদীবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সবেগে চলিয়াছে, সলিলরাশি তাহার আঘাতে বিক্ষুব্ধ ও স্ফুটিত হইয়া এবং নানা আকারে আকারিত ও সূর্য্যকিরণস্পর্শে নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। আচার্য্যদেব ষ্টীমারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই খেলা দেখিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন, দেখ, দেখ, কত হীরামণি মাণিক্য মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সৃষ্টি করিয়া, তদ্দ্বারা কতপ্রকার নূতন নূতন অলঙ্কার তৈয়ারী করিয়া, এদিকে ওদিকে ছুড়িয়া ফেলিতেছে,—মানুষের সাজপোযাক গহনাপত্র বিলাসভোগের সব চেষ্টাকে যেন উপহাস করিতেছে। এই সব কথা এমনভাবে বলিতেন, যে, তারপরে চাহিয়া দেখিলে ঠিক তদ্রূপই দেখা যাইত এবং সেইপ্রকার ভাবই মনে আসিত।

ষ্টীমার যখন পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হয়, তখন এক সময় পশ্চাতের দিকে মাত্র পার দেখা যায়, সম্মুখের দিকে কোন কূল দৃষ্টিগোচর হয় না। গভীর প্রশান্তভাবে সেই দৃশ্য সম্ভোগ করিতে করিতে আচার্য্যদেব বলিলেন, পেছনের দিকে চাহিও না, সাম্‌নে অনন্তপ্রসারিত জলধির প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখ; এই অপার জলধি পার হইয়া আমরা পরপারে পৌছিব, জান ত?

চাঁদপুরে গাড়ী ধরিয়া অতি প্রত্যুষে সীতাকুণ্ডে পৌছিলাম। দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করিলাম। নাভিগয়ায় শ্রাদ্ধ করা হইল। আচার্য্যদেবও যথাবিধি পিণ্ডদান করিলেন। সুফল দেওয়ার জন্য

একটি বালক উপস্থিত হইল। আমাদের সকলের পক্ষে আচার্য্য-দেব টাকা দিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন, এবং আমাদের তীর্থ দর্শন যে সফল হইয়াছে, তাহা সেই বালকটির মুখ হইতে জানিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যের হিসাবেও চন্দ্রনাথ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের একটা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রকৃতি দেবী এইক্ষেত্রে আপনার যে মূর্ত্তিটী প্রকাশ করিয়াছেন, যে সব ভাবের অভিব্যক্তি করিয়াছেন, তাহা আর কোথাও দেখা যায় না। 'সহস্রধারা' ও তাহার রাস্তা বাল্যকালে দেখিলেও তাহার চিত্র চিরকাল হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে। 'উনকোটি শিবের বাড়ীতে' জনপ্রাণিহীন পর্ব্বতের গুহায় প্রকৃতি-নির্ম্মিত অসংখ্য উর্দ্ধমুখ, অধোমুখ ও পার্শ্বমুখ শিবলিঙ্গের সভা, এবং তাহাদের প্রত্যেকের অঙ্গ বাহিয়া অবিরাম সুশীতল বারিধারা নিঃসরণ একটি অকল্পনীয় দৃশ্য। চন্দ্রনাথ পর্ব্বত হইতে দৃশ্যমান সমতলভূমির বৈচিত্র্য ও সমুদ্রের শোভা বিশেষ সম্ভোগের বস্তু। বাড়বকুণ্ডের ফুটন্ত জলে স্নান, পর্ব্বতগাত্রে স্থানে স্থানে স্বাভাবিক অগ্নিকুণ্ড ও দীপশিখা পরিদর্শন—সবই মনোহর।

আচার্য্যদেবের চোখে মুখে গতিভঙ্গীতে ভিতরের আনন্দের অভিব্যক্তি এবং মাঝে মাঝে চমৎকার চমৎকার উপমা দ্বারা দৃশ্য, শ্রাব্য ও উপভোগ্য জিনিষগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সর্ব্বত্রই উহাদের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বহু গুণ বাড়াইয়া দিত। পার্ব্বত্য ঝিঁঝিঁপোকার ধ্বনি পর্ব্বতগাত্রে প্রতিধ্বনিত হইয়া বেশ জমকাল ও মিষ্টি সঙ্গীতের সৃষ্টি করে। আচার্য্যদেব আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, আঃ, কি সুন্দর সঙ্গীত হইতেছে, শুনিতেছ?—'হরি ওম্ ওম্ ওম্'। একজন পথের সাথী উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া

বলিলেন, সত্যিই ত, চমৎকার, প্রকৃতির অবিরাম প্রণবজপ। তারপর হইতে সত্য সত্যই কাণে বাজিতে লাগিল—'হরি ওম্ ওম্ ওম্'। লোকে যাকে 'বউ কথা কও' পাখী বলে, তার ডাক শুনিলে আচার্য্যদেব বলিতেন যে, কৃষ্ণপ্রেমিকা কৃষ্ণকে হারাইয়া তাঁহারই অনুসন্ধানে ঘুরিতেছে, আর জিজ্ঞাসা করিতেছে, "সই কৃষ্ণ কৈ"। পাহাড়ে উঠিবার সময় সমুদ্রের দিক হইতে বাতাস আসিয়া গায় মাথায় লাগিয়া ক্লান্তি নিবারণ করে। আচার্য্যদেবের মনে হইত যে, স্নেহময়ী মা কত দূর দূরান্তর হইতে ছুটিয়া আসিয়া গায় মাথায় কোমল হাত বুলাইয়া সকল ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করিয়া দিতেছেন।

চট্টগ্রাম হইতে সমুদ্র পথে আদিনাথ যাইতে হয়। সমুদ্রের মধ্যে কয়েকঘণ্টা মাত্র থাকিতে হয়। ভোরে জাহাজে উঠিলাম। কিছুক্ষণ পরে গৈরিকপরা একদল অপরিচিত আদিনাথ-যাত্রী সাধু খড়ম ঠক্ ঠক্ করিয়া জাহাজে চড়িয়াই আচার্য্যদেবের নিকটে আসিলেন, এবং বলিলেন 'আপনি জগদীশ বাবু? এই নিন্ চিঠি।' আচার্য্যদেব অপরিচিত ব্যক্তিকে এইরূপ পরিচিতের ন্যায় সম্বোধন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনি চিনিলেন কিরূপে? সাধু বলিলেন, 'বাঃ, জগদীশকে চিনিব না?' আমরা ত অবাক্। মহেশখালী দ্বীপের মালিক জমিদার প্রসন্নবাবু আচার্য্যদেবের আদিনাথযাত্রার কথা শুনিয়া সমুচিত অভ্যর্থনার জন্য কাছারীতে তাঁহার পুত্রের নিকট চিঠি লিখিয়া দিয়াছিলেন। 'আদিনাথ' মহেশখালী দ্বীপেই নির্জ্জন বাস করেন।

জাহাজ যতক্ষণ সমুদ্রের মধ্যে ছিল, ততক্ষণ আচার্য্যদেবের কত প্রকার ভাবের অভিব্যক্তি দেখিলাম, ও কত ভাবের কথা শুনিলাম। সমুদ্রদর্শন আমার এই প্রথম, এবং সম্ভবতঃ আচার্য্যদেবেরও প্রথম।

এক একটি দৃশ্য দেখিয়া তিনি ভাবজগতে এক এক রাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। আমাদের অধিকারানুযায়ী দু চারটি বাণী আমাদিগকেও শুনাইলেন। কর্ণফুলী নদী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। সঙ্গমস্থলে মাঝে মাঝে দেখিলাম, সমুদ্র হইতে এক এক খণ্ড ঘননীল পরিষ্কার জল কোনক্রমে নদীর ঘোলা জলের আবেষ্টনীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, এবং কিছুক্ষণ যেন আপনার বৈশিষ্ট্য ও নৈর্ম্মল্য রক্ষা করিবার জন্য যথাসম্ভব লড়াই করিয়া অবশেষে হতাশভাবে ঘোলা জলের সঙ্গেই মিলিয়া যাইতেছে। আচার্য্যদেব সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেখাইলেন যে, দেখ সংসারের ঘোলার মধ্যে বা অসাধু আবেষ্টনীর মধ্যে এক একজন নির্ম্মলচরিত্র সাধু আসিয়া পড়িয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। আবার, সমুদ্রের মধ্যে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে স্থানে স্থানে ইহার বিপরীত দৃশ্য দেখা যাইতে লাগিল। সর্ব্বদিক্‌ব্যাপী পরিষ্কার নীলাম্বুরাশির মধ্যে এক একখণ্ড মলিন ঘোলা জল প্রবেশ লাভ করিয়া, তাহারই তরঙ্গের সঙ্গে নাচিয়া খেলিয়া, ক্রমশঃ তাহারই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে হইতে অবশেষে তাহার মধ্যেই আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইতেছে। আচার্য্যদেব সানন্দচিত্তে দেখাইয়া দিলেন যে, কোনক্রমে মহতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে কিংবা সাধুপ্রভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে কি সুন্দরভাবে জীবন কৃতার্থ হইয়া যায়।

সম্মুখে অনন্তপ্রসারিত নিশ্চল গম্ভীর মহাকাশের সহিত উত্তাল তরঙ্গমালাসুশোভিত অসীম মহাসমুদ্রের কোলাকুলি দেখিয়া তাঁহার কি আনন্দ! সেই আনন্দহিল্লোলের মধ্যে কখন পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ, কখন শিবশক্তির বিহার, কখন বুদ্ধচৈতন্যের মিলন,—এই প্রকার কত ভাবই যেন খেলিতে লাগিল। ভাষার ভিতর দিয়া

স্নেই সব ভাবের কিছু কিছু উথলিয়া পড়িতেছিল। আমরা প্রসাদ পাইলাম।

এক সময় ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন, ঐ দেখ বুদ্ধদেব, এবং নিম্নদিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন, এই দেখ চৈতন্যদেব। বুদ্ধদেব মহাকাশ এবং চৈতন্যদেব মহাসমুদ্র। দুইই মহান্‌, দুইই অসীম ও অগাধ। কিন্তু একজন স্থির ধীর নিশ্চল, জ্ঞান প্রেমের প্রশান্ত মূর্ত্তি, আর একজন তরঙ্গময়, প্রেমে মাতোয়ারা, হাসে, কাঁদে, নাচে গায়। সমুদ্র আমাদের নিকটে, ইহার মধ্যে ডুব দেওয়া যায়, সাঁতার কাটা যায়, ঢেউএর সাথে সাথে ভাসা যায়, ওঠা নামা যায়, হুড়াহুড়ি করা যায়, স্ফূর্ত্তি করা যায়, ঠাণ্ডাও হওয়া যায়। আকাশের মাধুর্য্য বুঝিতে হইলে, তাহার সঙ্গে প্রাণের স্পন্দন মিলাইতে হইলে, ধ্যানে বসিতে হয়, দেহেন্দ্রিয়মন সংযত করিয়া বুদ্ধিকে প্রশান্তবাহিনী করিতে হয়। সমুদ্রকে নিয়া খেলা যায়, আকাশকে দূব হইতে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিতে হয়।

আদিনাথ দর্শন করিয়া পুনরায় জাহাজে চড়িয়া কক্স বাজার গমন করিলাম; কক্স বাজারে বৌদ্ধদের প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখিয়া খুব আনন্দ হইল। সে দিন বিষুবসংক্রান্তি উপলক্ষে বৌদ্ধদের একটি বিশেষ উৎসব ছিল। দোলপূর্ণিমার রংখেলার অনুরূপ জল-খেলায় সে দিন বৌদ্ধ ছেলেমেয়েদের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ হইল। কিন্তু আচার্য্যদেবের বালকভাব প্রকাশ পাইল সমুদ্রস্নানে। জাহাজে সমুদ্র দর্শন মাত্রই হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে মাখামাখি হয় নাই। কক্স বাজারে সেই সুযোগ লাভ হইল। স্নানে যাইবার পথে দূর হইতে সমুদ্র দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ অব্যবহিত মিলনের সম্ভাবনাতেই আচার্য্যদেব আনন্দের আতিশয্যে বালকের ন্যায়

চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'অস্থ মে সফলং জন্ম'। তাঁহার ভাবাভি-ব্যক্তিতে সমুদ্র যেন আমাদের নিকট আরও সুন্দর হইয়া দেখা দিতে লাগিল। তীরে পৌঁছিয়াই প্রণাম করিয়া সকলেই ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। আচার্য্যদেবের নিউরাল্জিয়া-গ্রস্ত দেহে অবগাহন-স্নান সাধারণতঃ সহ্য হইত না। কিন্তু সমুদ্রাবগাহন হইতে বঞ্চিত হওয়া যে তদপেক্ষাও অসহ্য। তিনিও নামিয়া কতক সময় তরঙ্গের দোলায় তুলিয়া লইলেন। আমাদের সে আনন্দ ত্যাগ করিয়া উঠিতে অবশ্যই কিছু বেশী সময় লাগিল। তীরে উঠিবার পরেও সেই গম্ভীরাত্মা পুরুষের সারা দেহের ভিতরে যেরূপ একটা চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতে লাগিল, তাহাতে মনে হইল যে, তিনি অতিশয় সংযমের সহিত নাচিবার প্রবৃত্তি দমন করিতেছেন। এক একবার দৌড়িয়া আসিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিতেছেন, 'কেমন লাগে!' তাঁহার যেন ইচ্ছা হইতেছিল যে, তাঁহার আনন্দের তরঙ্গগুলি আমরা নাচিয়া দৌড়িয়া গড়াগড়ি করিয়া, চীৎকার করিয়া বাহিরে প্রকাশ করি।

মাঝে মাঝে তিনি বলিতে লাগিলেন, যে, আজ কেবলই জগন্নাথের কথা স্মরণ হইতেছে। হাত বাড়াইয়া বলিলেন, দেখ, ঠিক এই সোজা জগন্নাথক্ষেত্র। কি মনে হইতেছে, জান? 'এভবসাগর, হবে বালুচর, হাটিয়া হইব পার'। আমরা এক একবার তরঙ্গান্দোলিত আকাশা-লিঙ্গিত অনন্তপ্রসারিত মহাসাগরের মহীয়সী শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, আবার একএকবার এই ভাবান্দোলিত, জগন্নাথালিঙ্গিত বিশালহৃদয় মহাপুরুষের গাম্ভীর্য্যসংযমিত আনন্দহিল্লোল আস্বাদন করিতে লাগিলাম। আমার মনে হয় যে, তাঁহার এই দিনের ভাবমাধুরী দেখিবার সৌভাগ্য যদি না হইত, তবে তাঁহার হৃদয়ের একটা দিকের পরিচয় পাওয়া যেন বাকী থাকিত। কারণ, সেই দিনের সেই

বর্ষীয়ান্ বালকটীর সঙ্গে এমন ভাবে আর কখন আমার সাক্ষাৎ ঘটে নাই।

সমুদ্র তরঙ্গের একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। দূর হইতে এক একটি প্রকাণ্ড অখণ্ড তরঙ্গ সবেগে তীরের দিকে ধাবিত হইয়া আসে, এবং নিকটে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, তিন খণ্ড, চারি খণ্ড বা পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া, তীরের সহিত সংঘর্ষ করিতে থাকে। পাঁচ খণ্ডের বেশী কখন হয় না। এইটীই মায়াসাগরের স্বভাব। মায়াসাগরের অখণ্ড বিষয়তরঙ্গ আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমীপবর্ত্তী হইয়াই, শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ এই পঞ্চবিষয়রূপে বিভক্ত হইয়া আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং চিত্তের ভিতরে বিক্ষোভ উৎপাদন করে, কখন কখন পঞ্চেন্দ্রিয়েরই বিষয় না হইয়া কমও হয়, কিন্তু বেশী হয় না। তরঙ্গাঘাতে যাহাদের স্থিরভূমি হইতে পদস্খলন হয়, তাহারা হাবুডুবু খাইয়া নানাপ্রকার ক্লেশ পায় এবং কখন কখন অগাধ জলে পড়িয়া গিয়া প্রাণ হারায়। স্থিরভূমিতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া মায়াসাগরের খেলা সম্ভোগ করিতে পারিলে বেশ হয়। এসম্বন্ধে তিনি যে একটি চিত্র বর্ণন করিয়াছিলেন, পূর্ব্বেই প্রসঙ্গক্রমে তাহার আভাস দিয়াছি।

এইরূপে সেই এক সপ্তাহের ভ্রমণে আচার্য্যদেবকে দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া নানা প্রকার শিক্ষা লাভ হইয়াছিল। এই উপলক্ষে যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি, তন্মধ্যে অনেক জিনিষ জীবনের চিরসম্বল হইয়া রহিয়াছে। কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র এখানে দেওয়া হইল।

অতঃপর আচার্য্যদেবের ধর্ম্মোপদেশের ধারা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। এতৎসম্পর্কে দুইটি

বৈশিষ্ট্য আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, এবং এই দুইটি আমাকে চিরকাল বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। প্রথমতঃ তাঁহার উপদেশের মধ্যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্রও ছিল না। তিনি নিজেও কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান—সকল মত ও সকল সাধনপ্রণালী তাঁহার নিকট আদর পাইত। সকল সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিক লোকই তাঁহার উপদেশ শুনিয়া, তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া, আপ্যায়িত ও উপকৃত হইতেন। তাঁহার বাক্যে কাহারই নিজ নিজ গুরুপরম্পরাগত ভাবধারা ও সাধনধারায় বিক্ষোভ সৃষ্টি হইত না। মানব প্রকৃতি ও তাহার বিচিত্ররূপে অভিব্যক্তি, মানবমন ও তাহার বিচিত্র রুচি, শক্তি ও সংস্কার, পরম সত্য বস্তু ও বিভিন্ন মানবচিত্তে তাহার বিচিত্রভাবে প্রকাশ, মানব জীবনের চরম লক্ষ্য ও বিচিত্র ধারায় বিচিত্র স্বভাবান্বিত মানবের সেইদিকে জীবনের গতি, সনাতন মানবধর্ম্ম ও তাহার বাহ্যাকৃতির উপর দেশ, কাল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, মানসিক সংস্কার, বুদ্ধির বিকাশ প্রভৃতির বিভিন্নতার প্রভাব এইরূপ একের বৈচিত্র্য ও বিচিত্রের ঐক্য তিনি এমন গভীর ও ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যে, তাঁহার চিন্তার মধ্যে কোন বিরোধের অসমাধান থাকিত না। তিনি এক একটি সমস্যা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা অবলম্বনে সমাধান করিতেন, এবং মূলতত্ত্বের আলোকে তাহাদের ঐক্য সন্দর্শন করিতেন। সেই হেতু তাঁহার নিজের প্রাণের ভিতরেও কোন সঙ্কীর্ণতা বা গোঁড়ামি ছিল না, এবং তাঁহার উপদেশের মধ্যেও কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতা বা গোঁড়ামি প্রকাশ পাইত না। তিনি শৈবের

সহিত শৈবদৃষ্টিতে, বৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবদৃষ্টিতে, শাক্তের সহিত শাক্তদৃষ্টিতে, খৃষ্টান ও মুসলমানদের সহিত তাহাদের দৃষ্টিতে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব আলোচনা করিতেন; এবং মূল সাধ্যতত্ত্ব যে সকলেরই এক ও অভিন্ন, এবং মূল সাধনতত্ত্বও যে স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন ইহা প্রতিপাদন করিয়া প্রত্যেকেরই আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশের অন্তরায়স্বরূপ সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি দূর করিতে প্রয়াসী হইতেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গেই সমানভূমিতে দাঁড়াইয়া অকপট সহানুভূতির সহিত আলোচনা করিতেন বলিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে কাহারও দ্বিধাবোধ হইত না। বিশেষতঃ, যুক্তি প্রমাণ ব্যতীত তিনি কোন কথা বলিতেন না, নিজের মত বা অনুভূতি বলিয়া কোন সিদ্ধান্ত খ্যাপন করিতেন না, তাঁহার ব্যক্তিত্বের খাতিরে কিংবা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কোন কথা মানিয়া লইতে বলিতেন না।

অন্যদিকে বর্ত্তমান ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের মতবাদ, সাধনপদ্ধতি, ও আচারব্যবহারের মধ্যে যে সব কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অনাচার, ব্যভিচার, বাহ্যানুষ্ঠানসর্ব্বস্বতা, সার পরিত্যাগপূর্ব্বক খোসা লইয়া ব্যস্ততা, প্রভৃতি দোষ প্রবেশ করিয়াছে, সেইসব দোষ প্রদর্শন করিতেও তিনি কুণ্ঠিত, লজ্জিত বা ভীত হইতেন না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের কাছে তাহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়েরই আগন্তুক দোষগুলি সেই সেই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ও আচার্য্য মহাপুরুষগণেরই উপদেশের তাৎপর্য্য অবলম্বনে এবং মানবীয় ধর্ম্মের সনাতন আদর্শের আলোকে এমনভাবে তিনি দেখাইয়া দিতেন, যে, প্রত্যেকেই তাঁহাকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী সর্ব্বজনপ্রেমিক আচার্য্য বলিয়া অনুভব করিতেন,

কেহই তাঁহার প্রতি অন্য কোনরূপ ভাব পোষণ করিতে পারিতেন না। কোন ব্যক্তি জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি বিন্দুমাত্রও বিদ্বেষ বা ঈর্ষ্যা না থাকায়, সকলের প্রতিই অকৃত্রিম প্রেম তাঁহার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, তাঁহার গালাগালিও অনেকটা মিষ্ট বোধ হইত, এবং প্রত্যেক কথার মধ্যে একটা অদ্ভুত শক্তি নিহিত থাকিত।

একদিন আমাদের সম্মুখে একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ খৃষ্টধর্ম্ম-যাজক আচার্য্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বিভিন্ন দেশীয়, বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ানুবর্ত্তী বিশিষ্ট ধর্ম্মার্থিগণ এইরূপ অনেকেই আসিতেন। যাঁহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ অনু-রাগ আছে, এমন কোন নবাগত ব্যক্তি বরিশালে আসিলে স্বভাবতঃই আচার্য্য জগদীশের নাম ও প্রশংসা শুনিতেন, এবং এরূপ মহাত্মাকে দর্শন করিতে ও তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতে স্বভাবতঃই আগ্রহান্বিত হইতেন। পূর্ব্বোক্ত সাহেব আসিয়া বারান্দায় তক্তাপোষের উপর বসিলেন, এবং আচার্য্যদেব তাঁহার সেই ভাঙ্গা মোড়ায় বসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। খৃষ্টানধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম এবং খৃষ্টের জীবন ও উপদেশ ও কৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা আরম্ভ হইল। সাহেব তাঁহার স্বাভাবিক ও অর্জ্জিত সংস্কার অনুসারে খৃষ্ট ও খৃষ্টানধর্ম্মের প্রাধান্য সম্বন্ধে চিরপ্রচলিত যুক্তিসমূহের উত্থাপন করিলেন। আচার্য্যদেব বাইবেল, গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, সেই সব প্রামাণিক বাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া, তৎসঙ্গে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করিয়া উভয় ধর্ম্মের ভিত্তিগত ঐক্য ও আকারগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিলেন। যাহারা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী

বা নিয়া পারিচিত, তাহারা যে অনেক ক্ষেত্রেই খৃষ্টকে অনুসরণ করে না, খৃষ্টের উপদেশের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে যথোচিত চেষ্টাও করে না, খৃষ্টের প্রতি বিশ্বাসের যথাথ মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে না, ইহাও তিনি যুক্তিসহকারে দেখাইয়া দিলেন। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান আচারব্যবহার, সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামি প্রভৃতি দেখিযা বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম ও চৈতন্যের ধর্ম্ম সম্বন্ধে—কোন ধারণা করিলে যে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হইবে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্বরূপ বোঝা যাইবে না, তাহাও তিনি প্রদর্শন করিলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতরে যে সব গলদ ঢুকিয়াছে, সাহেবের নিকটে তাহা স্বীকার করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। বৈষ্ণব ধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ সাহেবকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও খৃষ্টানধর্ম্ম উভয়েরই যে বিশেষ সংস্কার আবশ্যক, তাহা ঘোষণা করিয়া তিনি বলিলেন—In truth, Christianity has to be rechristianised and Vaishnavism has to be re-vaishnavised.

আচার্য্যদেব অনেক সময় কালীবাড়ী যাইতেন এবং কালীমূর্ত্তির সম্মুখে বহুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতেন। কালীবাড়ীর সিদ্ধ মহাপুরুষ পূজ্যপাদ সোনাঠাকুর যত দিন স্থূল দেহে ছিলেন, ততদিন ত প্রায়ই যাইতেন। উভয়ের মধ্যে এমন প্রেমের আকর্ষণ ছিল, যে, জগদীশকে দু একদিন দেখিতে না পাইলে সেই সর্ব্বত্যাগী মহা পুরুষের যেন অস্বস্তিবোধ হইত এবং তিনি তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন ও সংবাদ পাঠাইতেন, এবং জগদীশেরও তাঁহাকে না দেখিলে যেন চলিত না, তাঁহার নিকটে প্রায়ই গিয়া কতক্ষণ সঙ্গ করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেও আচার্য্যদেবের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, পূর্ব্বে আরও

বেশী ছিল। ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহাকে তাঁহাদেরই একজন মনে করিতেন। আচার্য্যদেবের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি কালীবাড়ীতে রোজ রোজ যান কালীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকেন, সেই মূর্ত্তির নিকটে ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করেন, ইহা তাঁহার ব্রাহ্মবন্ধুদের দৃষ্টিতে নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইত। কেহ কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, তাঁহার মত একজন Rationalist (অর্থাৎ কুসংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী জ্ঞানী লোক) এরূপ করেন কেন, ইহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনে কি উপকার হয়? তিনি বলিয়াছেন যে, এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরে তিনি কালী সম্বন্ধে তাহার ভাব এইরূপ ব্যক্ত করিতেন। তিনি দেখেন যে, একটি প্রকাণ্ড মেয়ে, উলঙ্গ—কারণ কোন কাপড়ে তাহাকে বেষ্টন করিতে পারে না, তাঁহার আদি অন্ত মধ্য কিছুই পাওয়া যায় না, অনবরত চলাই তাঁহার স্বভাব, তাঁহার চলার ভিতরেই সব শক্তির অভিব্যক্তি, তিনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রসব করিতেছেন, কোলে তুলিয়া কিছুক্ষণ লালন পালন করিতেছেন, আবার গ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন, তাঁহার এই স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম হইতেই বিশ্বের সব কিছুর উৎপত্তি স্থিতি ধ্বংস, আবার, এই কর্ম্মের সঙ্গেই তিনি বাম হস্তে স্বপ্রসূত অশুভ শক্তিগুলির বিনাশ সাধন করিতেছেন ও দক্ষিণ হস্তে অভয় শান্তি মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তাঁহার নিত্য আশ্রয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ শিব স্বয়ং নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার থাকিয়া তাঁহাকে ধারণ করিয়া আছেন, এবং তাঁহারই বুকের উপর দাঁড়াইয়া ঐ মেয়েটী নিত্যকাল নাচিতে নাচিতে তাঁহার বিশ্বময় খেলা খেলিয়া চলিয়াছেন। ঐ মেয়েটীকে মা বলিয়া তাঁহার শরণাগত হইলে, নিজের ভিতরের অসুর নাশ হয়, অভয় অমৃত ক্ষেম লাভ হয়, এবং তাঁহার কার্য্যের প্রতি উদাসীন হইয়া

উপাসনা মন্দির

তাঁহার চরণতলে পতিত হইতে পারিলে শিবের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া যায়। এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া তিনি তাঁহার প্রশ্নকারীদিগকে পাল্টা জিজ্ঞাসা করিতেন, যে দেখুন দেখি, এর মধ্যে কিছু irrational আছে কিনা? কালীমূর্ত্তির ভিতরে ব্রহ্ম ও তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহাশক্তির স্বরূপটী এমন ভাবে পরিস্ফুট, ইহা তাঁহার মুখে শুনিয়া ব্রাহ্মবন্ধুগণ অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া কালীমূর্ত্তির ভিতরে তিনি কি দেখেন এবং আমরা কি দেখি, তাহা চিন্তা করিয়া, তাঁহার চক্ষু যে কিরূপ ভিন্ন উপাদানে গঠিত হইয়া গিয়াছে, বিস্ময়াভিভূত চিত্তে তাহা ভাবিতে লাগিলাম। এইরূপে, কোন্ দেবমূর্ত্তিতে কি প্রকার ভাগবত ভাব প্রকটিত এবং কিরূপ দৃষ্টি লইয়া দেবমূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়, তাহা আচার্য্যদেবের নিকটে নানা উপলক্ষে শিক্ষা পাইয়া ধন্য হইয়াছি।

আচার্য্যদেবের আশ্রমে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি উপাস্যরূপে সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি এ ক্ষেত্রে এরূপ সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় কেন দিতেছেন, এ সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। এ বিষয় তাঁহার মত যাহা বুঝিয়াছি, তাহা এই। তত্ত্বতঃ কৃষ্ণ, কালী, শিব, দুর্গা, গণেশ, সূর্য্য প্রভৃতি সব উপাস্য দেবতাই এক, কোন ভেদ নাই। পার্থক্য নামে ও রূপে, স্বরূপে কোন পার্থক্য নাই। রাম, নৃসিংহ, বুদ্ধ, জিন,—যে নামেই ভগবান্‌কে স্মরণ করা হউক ও যে রূপেই তাঁহাকে ধ্যান করা হউক, বস্তুতঃ ধ্যেয়, স্মরণীয়, আশ্রয়নীয় একঁ সর্ব্বনামাতীত সর্ব্বরূপাতীত অদ্বিতীয় ভগবান্। আমরা নামরূপের অধীন, সেই হেতু নামরূপ অবলম্বনেই নামরূপাতীতের সহিত আমাদের চিত্তে যোগসাধন করিতে হয়। বিভিন্ন নামে, বিভিন্নরূপে ভগবানের আরাধনা মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক মানব সমাজে প্রচারিত হইয়াছে,

এবং তাহার ফলে বিভিন্ন সাধনার ধারা ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ নিজের রুচি বুদ্ধি প্রকৃতির অনুকূল এবং দেশকাল পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল এক একটি ধারা অবলম্বন করিয়া, ক্রমশঃ দেহ মন বুদ্ধির বিশুদ্ধি সম্পাদনপূর্ব্বক ও জ্ঞানভক্তির বিকাশসাধনপূর্ব্বক, চরমে সকল সাধনধারার লক্ষ্য এক অভিন্ন ভগবত্তত্ত্বে পৌঁছিতে পারে। তখন কোন সাম্প্রদায়িকতাও থাকে না, ভেদবুদ্ধিও থাকে না, ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র সকল নামরূপের মধ্যে এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দঘন ভগবানেরই সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

এক একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে, এক একটি সাধনধারার মধ্যে ভাগবতভাবের এক একটি দিক্ বিশেষরূপে পরিস্ফুট ও বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব, ভগবানের সহিত জীবজগতের সম্বন্ধ, সাধ্যের সহিত সাধকের সম্বন্ধ,—ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার মধ্যে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্য তাহাদের দূষণ নয়, ভূষণ; তৎসম্বন্ধে গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতাই দূষণীয়।

এই সব বিশিষ্ট চিন্তাধারা ও ভাবধারার বৈশিষ্ট্য বিচার করিলে, শ্রীমদ্ ভাগবত ভগবত্তত্ত্বটী ক্রমাভিব্যক্তির পদ্ধতিতে ক্রমশঃ ইহার আবরণের পর আবরণ উন্মোচন করিতে করিতে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের ভিতরে যেমন পরিপূর্ণরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন এবং বাংলার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিজের গভীরতম অনুভূতির প্রকাশ দ্বারা এই তত্ত্বটী যে ভাবে নিজের অন্তরঙ্গ ভক্তদের হৃদয়ে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহার মধ্যে সকল ভাব ও চিন্তার পরাকাষ্ঠা আচার্য্য জগদীশ দেখিতে পাইয়াছিলেন। ভাগবত ও চৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণ-

প্রেমের মধ্যে সকল কর্ম্মসাধনা, জ্ঞানসাধনা ও ভক্তিসাধনার চরম পরিপূর্ণতা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন।

সর্ব্বভাবাতীত অবাঙ্‌মনসগোচর কেবলাদ্বৈত ভগবান্‌কে আমরা ধারণার বিষয়ীভূত করিতে পারি না, সুতরাং তাঁহার আরাধনাও সম্ভব হয় না। ভাব অবলম্বনেই তাঁহার ধারণা ও আরাধনা সম্ভব হয়। ভাবের মধ্যেই তিনি ব্যক্ত হন, বিশেষ আকার পরিগ্রহ করেন, বিশেষ গুণগণে ভূষিত হন। ভাবের দৃষ্টিতেই তিনি লীলাময়রূপে আস্বাদ্য হন, শক্তি ঐশ্বর্য্য জ্ঞান কর্ম্মাদির আধাররূপে গ্রাহ্য হন। ভাবসমষ্টিই তাঁহার দেহ, তাঁহার আত্মপ্রকাশক্ষেত্র, তাঁহার আত্মাস্বাদনক্ষেত্র। ভাবের সঙ্গে যোগেই তাঁহার সকল সম্বন্ধ এবং সকল গুণ ও কর্ম্ম। যে ভাবের মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বজগৎ একটা প্রকাণ্ড সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেই ভাবের ভাবুক এই জগতের সম্বন্ধে তাঁহাকে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তারূপে ধারণা করিয়া তাঁহার আরাধনা করেন। আবার, যে ভাবের মধ্যে এই জগৎ-বৈচিত্র্য মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সেই ভাবের ভাবুক তাঁহাকে মায়াতীত সংসারাতীত অশব্দ-অস্পর্শ-অরূপ-অব্যয় প্রভৃতি নিষেধাত্মক ভাবের সাহায্যে ধারণা ও ধ্যান করেন। তাঁহাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভাবি, বা দয়াময় প্রেমময় মহিমময় ভাবি, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভাবি, কিংবা জ্ঞানাতীত ভাবাতীত শক্ত্যৈশ্বর্য্যবিবর্জ্জিত ভাবি, তাঁহাকে সগুণ ভাবি বা নির্গুণ ভাবি, সাকার ভাবি বা নিরাকার ভাবি,—সবই ত আমাদের ভাবনা, সবই ত ভাব-অবলম্বনে ও ভাবানুরূপ সম্বন্ধ-অবলম্বনে তাঁহার ধারণা ও চিন্তা। যখন তাঁহাকে ভাবাতীত বলি, তখনও ভাবাশ্রয় করিয়াই সকল বিশেষভাবের নিষেধ দ্বারা তাঁহার সম্বন্ধে একটা অস্ফুট ধারণা

করিবার চেষ্টা করি। ভাব ব্যতীত ভগবানের স্বরূপোপলব্ধি জীবের পক্ষে ত সম্ভব নয়ই, তাঁহার নিজের পক্ষেও সম্ভব বলিয়া জীব কখন ভাবিতে পারে না।

ভাবই যখন জীবের ভগবৎ-স্বরূপোপলব্ধির ক্ষেত্র, তখন ভাবের বিকাশের উপর ভগবানের স্বরূপ প্রকাশের তারতম্য নির্ভর করে। ভাব যত নির্ম্মল হয়, যত গভীর হয়, যত পূর্ণরূপে বিকসিত হয়, ভগবানের স্বরূপও ততই নির্ম্মল ও নিরাবরণ হইয়া, উজ্জ্বলতর ও পূর্ণতররূপে আত্মপ্রকাশ করে। ভাবের উৎকর্ষ সাধনদ্বারাই ভগবৎ-স্বরূপ প্রকাশের উৎকর্ষ নিরূপিত হয়। ভাব যেমন এক এক ভূমি হইতে উন্নত ও উন্নততর ভূমিতে আরোহণ করিতে থাকে, ভগবানেরও তেমনি নূতন নূতন শক্তি ও ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, জ্ঞান ও প্রেম তাহার মধ্যে প্রকটিত হইতে থাকে। নিম্নতর ভাব ভূমিতে ভগবানের যে স্বরূপ বা প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া, শক্ত্যৈশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা ও জ্ঞানপ্রেমের পরাকাষ্ঠা বোধ হইত, উন্নততর ভাবভূমিতে তাঁহার পূর্ণতর স্বরূপের প্রকাশ দেখিয়া পূর্ব্বের অনুভূতিই অপূর্ণ প্রতিপন্ন হয়। ভাব যখন পরম পরাকাষ্ঠায় উপনীত হয়, ভগবৎস্বরূপেরও তখন পূর্ণতম প্রকাশ হয়। সুতরাং ভগবানকে ভাবিতে হইলেই ভাবকে পার্শ্বে রাখিয়া ভাবিতে হয়। ভগবানের বিশেষ বিশেষ রূপ, গুণ ও মাহাত্ম্য চিন্তা করিবার সময়, কোন্ জাতীয় ভাবের আশ্রয়ে সেই সেই রূপ গুণের ও মাহাত্ম্যের আবির্ভাব তাহা পরিজ্ঞাত থাকা উচিত। নচেৎ প্রকাশ বিশেষকেই পূর্ণস্বরূপ বোধ করিয়া সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির অধীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; এই হেতু ভক্ত ও ভগবানকে একসঙ্গে চিন্তা করিতে হয়, কারণ বিশিষ্ট ভক্তের বিশিষ্ট ভাবের দর্পণে ভগবানের বিশিষ্ট প্রকাশ।

ধ্রুব প্রহ্লাদ, জড়ভরত, অজামিল, গজেন্দ্র, বলি, বৃত্রাসুর, অম্বরীষ, নারদ, উদ্ধব, অর্জ্জুন প্রভৃতি এক এক ভক্ত এক এক জাতীয় ভাবের প্রতিমূর্ত্তি, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকটে ভগবৎস্বরূপ প্রকাশের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আবার এক এক জন ভক্তের সাধনজীবনে ভাবের ক্রমবিকাশে ভগবানের আবির্ভাবও নূতন নূতন রূপে হইয়া থাকে। ভাবের পরিপূর্ণতা ব্যতীত ভগবানকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি ও আস্বাদন করা সম্ভব নয়।

ভাবের পরম পরাকাষ্ঠার নাম মহাভাব। যে অবস্থায় পৌছিয়া ভাব পরিপূর্ণরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, যে অবস্থায় উন্নীত হইলে সকল ভাবের সম্যক্ সার্থকতা হয়, ভাবের সেই নিত্য আদর্শ অবস্থাই মহাভাব নামে আখ্যাত। মহাভাব 'নিঃশেষ-ভক্তগণ-ভাবসমূহ-মূর্ত্তি'। সুতরাং মহাভাবের মধ্যেই ভগবৎস্বরূপের পূর্ণতম প্রকাশ। অতএব মহাভাব-প্রতিফলিত ভগবানই চরম আরাধ্য তত্ত্ব। স্বকীয় ভাবের ক্রমোৎকর্ষ সাধনদ্বারা মহাভাবে উন্নীত করিতে পারিলে, ভক্তের সাধনার পরিসমাপ্তি, এবং তখনই আরাধ্য ভগবানের পরিপূর্ণতম অনুভূতি ও আস্বাদন। মহাভাবই ভক্তের সাধনার চরম আদর্শ। প্রত্যেকটি ভাবই মহাভাবের এক একটি অঙ্গবিশেষ, এবং প্রত্যেক ভাবের আধারে সেই মহাভাবাস্বাদ্য পরমারাধ্যেরই আংশিক প্রকাশ হইয়া থাকে।

যাঁহার মধ্যে এই মহাভাব নিত্য পরিপূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান, বঙ্গীয় বৈষ্ণব পরিভাষায় তাঁহারই নাম শ্রীরাধা। শ্রীরাধা মহাভাবময়ী মহাভাবস্বরূপা। সুতরাং শ্রীরাধা ভক্তের নিত্য পরিপূর্ণ আদর্শস্বরূপা। শ্রীরাধার পরম প্রেমময় ভজন ও আস্বাদনক্ষেত্রেই সর্ব্বারাধ্য ভগবানের নিত্য পরিপূর্ণ প্রকাশ। এই ক্ষেত্রেরই পারিভাষিক নাম

মধুর বৃন্দাবন। অতএব শ্রীরাধালিঙ্গিত শ্রীরাধারাধিত শ্রীরাধাস্বাদিত শ্রীভগবানই পরমারাধ্য ভগবত্তত্ত্বের সম্যক পরিপূর্ণ প্রকট মূর্ত্তি, এবং তাঁহারই নাম শ্রীরাধাকৃষ্ণ। এই শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি হইলে ভগবানের পূর্ণতম স্বরূপের অনুভূতি হইল এবং এই অনুভূতির চরম অবস্থায় সাধকের দেহ মন প্রাণ সম্পূর্ণরূপে প্রেমরসভাবিত হইয়া পূর্ণতম ভগবৎস্বরূপের সহিত অভিন্ন ভাবে মিলিত হয়। আরাধ্য ও আরাধকের ভগবত্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের এই পূর্ণতম প্রকাশ ও পূর্ণতম বিকাশের অবস্থায় যে অভেদ ভাবানুভূতি, এই যে আস্বাদ্যাস্বাদক ভেদবর্জ্জিত আস্বাদনমাত্র স্বরূপে বিরাজমানতা, এই যে দ্রষ্টৃদৃশ্য-ভোক্তৃভোগ্যাদি ভেদলেশবিহীন আনন্দস্বরূপে অবস্থিতি, তাহা সকল ভাবের অতীত, জ্ঞানের অতীত, ধারণার অতীত।

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা যেমন একদিকে জীবসাধনার নিত্য পরিপূর্ণ আদর্শ, তেমনি অন্যদিকে ভগবানের নিত্য পূর্ণতম আত্মাস্বাদন ক্ষেত্র। রসস্বরূপ ভগবানের আত্মাস্বাদনই স্বভাব। তিনি আপনার বহিরঙ্গা মায়াশক্তি, তটস্থা জীবশক্তি ও অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির বিচিত্র বিলাসদ্বারা আপনাকেই আপনি বিচিত্রভাবে আস্বাদন করিতেছেন। মায়াশক্তি-বিলসিত বিচিত্র জগতের মধ্যে আপনার স্বরূপ আপনি আবৃত করিয়া একজাতীয় বিভিন্ন ভাবে তিনি আপনাকে সম্ভোগ করিতেছেন। তটস্থা শক্তির বিলাসে ক্রমবিকাশমান নানাশ্রেণীর জীবরূপে আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া তাহাদের বিচিত্র ভাবের সহিত বিচিত্র সম্বন্ধে আপনাকে তিনি প্রকারান্তরে বিচিত্ররূপে সম্ভোগ করিতেছেন। জড় অপেক্ষা জীবের ভিতরে তাঁহার পূর্ণতর আত্মপ্রকাশ ও আত্মসম্ভোগ। জীবের মধ্যে

মানুষ ও মানুষের মধ্যে ভক্ত ক্রমশঃ তাঁহার উজ্জ্বলতর ও পূর্ণতর আত্মপ্রকাশ ও আত্মাস্বাদনের ক্ষেত্র। জড়ের ভিতরে বিচিত্র ব্যক্তিত্ব ও শক্তিরূপেই তাঁহার প্রকাশ ও আস্বাদন, কিন্তু জীবের ভিতরে এই বিচিত্র শক্তি চেতনভোক্তা ও কর্ত্তারূপে অভিব্যক্ত। মানুষের ভিতরে যে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ভক্তির ক্রমবিকাশ, ইহা তাঁহার তটস্থা শক্তির কর্ম্মক্ষেত্রে অন্তরঙ্গা শক্তিরই প্রভাব বিস্তার, এবং তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ ও স্বরূপাস্বাদনের ক্ষেত্রের নৈর্ম্মল্য ও ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন। অন্তরঙ্গা শক্তির বিলাসের মধ্যে—ইচ্ছা জ্ঞান ও ভক্তির প্রকাশের মধ্যে—তিনি ক্রমশঃ নিরাবরণ ও পরিপূর্ণভাবে আপনাকে আপনি সম্ভোগ করেন। ক্রমবিকাশের পথে ইচ্ছা ও জ্ঞান ক্রমশঃ ভক্তির মধ্যে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য মিলাইয়া দেয়, সন্ধিনী শক্তি ও সম্বিৎশক্তি হ্লাদিনীশক্তির অঙ্গীভূত হইয়া অন্তরঙ্গা শক্তির পূর্ণস্বরূপ প্রকাশ করে। অন্তরঙ্গা শক্তির সারভূতা হ্লাদিনী শক্তি বিচিত্র ভাববিলাসের ভিতর দিয়া মহাভাবরূপে আপনার পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ করে। সুতরাং মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ভগবানের অন্তরঙ্গা সচ্চিদানন্দময়ী শক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশরূপা, এবং স্বকীয়া শক্তির এই পরিপূর্ণ প্রকাশের মধ্যেই ভগবান আপনাকে পরিপূর্ণ-স্বরূপে প্রকাশ ও আস্বাদন করেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা এই পূর্ণতম আত্মপ্রকাশময় ও পূর্ণতম আত্মাস্বাদনময় ভগবানেরই উপাসনা।

শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বিচার ও অনুভূতির ফলে আচার্য্য জগদীশ স্বীয় আশ্রমের ভজন মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সর্ব্বোপরি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু যাবতীয় তত্ত্বই এই পূর্ণতত্ত্বের অঙ্গীভূত বলিয়া, সেখানে সকল দেবতারই আরাধনা আছে, সকল মহাপুরুষেরই

সম্বর্দ্ধনা আছে, এবং বিচিত্র দেবমূর্ত্তি ও মহাপুরুষ মূর্ত্তিতে গৃহটী ভরপূর হইয়া আছে। তিনি আমাদিগের চিত্তে দৃঢ়রূপে এই আদর্শটী অঙ্কিত করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেন যে, এই ভজনালয়টী এমন ভাবে রক্ষা করিতে হইবে, যাহাতে হিন্দু মাত্রেই এখানে আসিয়া সনাতন ধর্ম্মের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি দেখিতে পায়, সকল সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের যথার্থ সমন্বয়ের চেহারাটী এখানে ফুটিয়া উঠে, মহাজনদের প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত কোন ভাব, মত ও সাধনার এখানে বিন্দুমাত্রও অবমাননা বা উপেক্ষা না হয়, কেহ এখানে কোনরূপ আঘাত না পায়, এবং সকলেই এখানে আসিয়া নিজ নিজ সাধনায় উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আস্থা লাভ করে। এই আদর্শটী যথাযথভাবে পোষণ করিতে না পারিলে, বস্তুতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্বেরই অবমাননা হইবে, মহাভাবারাধিত রসরাজের পরিপূর্ণ স্বরূপটীর আবরণ সৃষ্টি করা হইবে।

আচার্য্যদেব নিজের উপদেশের মধ্যে জনসাধারণকে—সাধারণ অধিকার সম্পন্ন লোকসমূহকে—বিশেষভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার কথা বলিতেন না, অন্যান্য আরাধ্যদেবতাসকল অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রখ্যাপন করিতেন না। যেহেতু, তাহা করিলে তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ আসন হইতে নীচে নামান হইত, তাঁহাকে সাম্প্রদায়িক দেবতা বিশেষে পরিণত করা হইত, তাঁহার অন্তর্হৃদয়ের আদর্শ শ্রীরাধাকৃষ্ণের একটী বিশেষ প্রকাশরূপে তাঁহাকে পরিগণিত করা হইত। সকল দেবতার উপসনাকেই তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিশেষ বিশেষ ভাবের উপাসনা বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন, উপাসকের ভাবানুযায়ী শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিশেষ প্রকাশ বা বিগ্রহরূপে প্রত্যেক উপাস্যমূর্ত্তিকে গ্রহণ করিতেন। সুতরাং কোন দেববিগ্রহই তাঁহার উপেক্ষণীয় ছিল না, কোন সম্প্রদায়ই তাঁহার স্বসম্প্রদায়বহির্ভূত ছিল না, কোন

সাম্প্রদায়িক আচার্য্যই তাঁহার বিরুদ্ধবাদী হইতে পারিত না। সকলকেই তিনি আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পারিতেন, সকল মতেরই সারবত্তা তিনি উপলব্ধি করিতে পারিতেন, সকল মতাবলম্বী লোককেই তিনি তাহাদের নিজ নিজ ভাবপোষক উপদেশ দিতে পারিতেন। বর্ত্তমান যুগের যুবকদিগকে তিনি সাধারণতঃ গীতার শ্রীকৃষ্ণের ভাবটাই গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের গভীরতম অনুভূতির প্রতীকটীকে যেমন তিনি সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তেমনি মহাপ্রভুর জনসাধারণের জন্য প্রচারিত ভগবৎ-নাম সাধনার প্রতীকটী—'নামব্রহ্ম' —তাহারই অব্যবহিত নিম্নে স্থাপন করিয়াছেন। গুরুর ঐকান্তিক আনুগত্যে গুরুদত্ত ইষ্টনামের সানুরাগ ভজনই যে ভগবৎ প্রেম-বিকাশ ও ভগবৎস্বরূপোপলব্ধির সোপান, এই সাধন রহস্যটী তিনি সমুজ্জ্বলরূপে নামব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। সকল সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণের প্রতিই তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু যুগাবতার শ্রীচৈতন্যের প্রতি তাঁহার প্রাণের গভীরতম প্রদেশে একটা প্রেমপূর্ণ মমতা ছিল মাঝে মাঝে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, রামানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জ্ঞান, তপস্যা, শক্তি, প্রেম, ভক্তি, উদারতা, মহানুভবতা প্রভৃতি সদ্গুণ রাশির মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে তাঁহার ভাবাবেশ দেখা যাইত, তাঁহার বাক্যেরও ফোয়ারা ছুটিত। কিন্তু বাংলার অবতার শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে কথা উঠিলেই বোঝা যাইত যে, নিতান্ত আপন জনের কথা হইতেছে। তাঁহার ভিতরে তিনি সকল ভাবের পরিপূর্ণতা দেখিতেন। মানবীয় সাধনার এত উচ্চ আদর্শও আর কেহ জীবনে প্রতিফলিত

করিয়া দেখান নাই, ভগবত্তত্ত্বের এমন পরিপূর্ণ জ্ঞানও আর কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই, এবং তৎসঙ্গে এমন সহজ সাধনার পথও আর কেহ দেখাইয়া দেন নাই, ভগবানকে এমন আপন করিয়া আমাদের সম্মুখে আর কেহ উপস্থিত করেন নাই। মানবের দেহেন্দ্রিয়ের দাবী, হৃদয়ের দাবী, বিচার বুদ্ধির দাবী, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আবেষ্টনীর দাবী, সব স্বীকার করিয়া জীবনের সকল বিভাগের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, সমগ্র জীবনটীকে সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত ও ভগবৎপ্রেমরসাভিষিক্ত করিবার যে অপূর্ব্ব কৌশলটি আমাদের এই বাংলার ঠাকুরটী দেখাইয়া গিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে ইহা অতুলনীয়। আচার্য্যদেব কখন কখন দুঃখের সহিত বলিতেন যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ যদি এই ঘরের ঠাকুর চৈতন্যদেবকে চিনিতে ও সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারিত, তবে অস্পৃশ্যতানিবারণ, হিন্দুমুসলমান মিলন প্রভৃতি আজ এমন জটিল সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত না।

আচার্য্যদেব আর একটি কথা মাঝে মাঝে বলিতেন যে, চৈতন্য বুদ্ধ প্রভৃতি অনন্যসাধারণ মহাপুরুষদিগকে ভগবদবতার বলিয়া প্রচার করায় আমাদের কিছু লোকসান হইয়াছে, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা এখন তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া, সম্মান দেখাইয়া, দণ্ডবৎ দিয়াই তৃপ্ত হই, তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ও তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করি; তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে সাহস পাই না, তাঁহাদের সাধনার অনুসরণ করা আমাদের ন্যায় সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভব মনে করি না, এবং সেইহেতু তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে জীবনটীকে পরিচালিত করিতে যথোচিত

পুরুষকারও প্রয়োগ করি না। তাঁহাদিগকে যদি আদর্শ মানুষ, আদর্শ সাধক, আদর্শ প্রেমিক ভক্তরূপে আমাদের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিতাম, তাঁহাদের ভিতরে প্রকটিত ভগবদ্‌ভাবের উপর জোর না দিয়া পূর্ণমানব-ভাবের উপর জোর দিতাম, তাহা হইলে সাধন জীবনে আমাদের অধিকতর কল্যাণ হইত, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব কম হইত, এবং তাঁহাদিগকে মানবতার আদর্শ রূপে সম্মুখে রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইতে পারিতাম। করুণানিধান ভগবান্ যে উদ্দেশ্যে আমাদের এত নিকটে চোখের সামনে এতাদৃশ আদর্শ জীবন সকল উপস্থিত করিয়াছিলেন, 'স্বয়ং আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখাইতে' মানুষ হইয়া আসিয়াছিলেন—তাঁহাদের ভগবত্তার দিকে বেশী নজর দিয়া আমরা সেই উদ্দেশ্যই যেন অনেকটা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছি।

আচার্য্যদেবের জীবন ও উপদেশের অন্য যে দিকৃটি আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিত, সেটি হইতেছে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়। তিনি যে কোন বিষয়েরই উপদেশ করিতেন, তাহার মধ্যেই এই তিনটি ধারার যোগ দেখা যাইত। কি ব্যবহারিক বিষয়, কি আধ্যাত্মিক বিষয়, কোথাও এই যোগসূত্র ছিন্ন হইত না। তাঁহার দৃষ্টিতে জীবনের কোন কর্ম্ম, কোন জ্ঞানচর্চ্চা, কোন দয়াদাক্ষিণ্য স্নেহমমতা শ্রদ্ধাপ্রীতি অধ্যাত্মজীবনের সাধনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইত না। তাঁহার নিজের ব্যবহারিক জীবনের সকল বিভাগেরই কেন্দ্র ছিল ভগবদারাধনা, এবং ভগবদারাধনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপেই তাঁহার জীবনের সকল ব্যাপার সংসাধিত হইত। তাঁহার উপদেশও তদনুরূপ ছিল। যাঁহারা বিজ্ঞানের গবেষণা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত তিনি বলিতেন

যে, তাঁহারা ভগবানেরই প্রকৃতিরাজ্য তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া এক একটি সত্য আহরণপূর্ব্বক ভগবানেরই চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। ইহা ত অতি সুন্দর সাধনা। যাঁহারা ইতিহাস আলোচনা করেন, তাঁহারা মানবজগতে ভগবানেরই বিচিত্র লীলা অনুসন্ধান ও আস্বাদন করিয়া তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। যাঁহারা দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় নিরত, তাঁহারা জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা তাঁহারই স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য সাধন করিতেছেন। সাহিত্য ও কলা বিদ্যার অনুশীলনের মধ্যে ত সেই রসস্বরূপেরই প্রেম ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতি।

যাঁহারা জাতি ও সমাজের সেবা করিতেছেন, ভগবান্ই জাতি-রূপে, সমাজরূপে তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিতেছেন। গৃহস্থ পারি-বারিক কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও প্রেমের সহিত সম্পাদন করিতেছেন, তাহাও ত তাঁহারই সেবা। ভগবান্ই আমাদিগকে বিচারশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, প্রেমশক্তি প্রভৃতিতে শক্তিশালী করিয়া এবং সেই সব শক্তির বিকাশ ও প্রয়োগের সুবিধা দিয়া, তাঁহারই জগতে তাঁহারই সেবার জন্য পাঠাইয়াছেন, আবার তিনিই পিতামাতারূপে, ভ্রাতাভগ্নীরূপে, পুত্রকন্যারূপে, সাধুভক্তরূপে, দীন-দুঃখীরূপে, জাতিসমাজরূপে, জীবজন্তুরূপে, আমাদের সত্যানুরূপ ও অবস্থানুরূপ সেবা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন। তাঁহারই সেবায় তাঁহারই দেওয়া শক্তি ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেই আমরা কৃতার্থ হই। সকল প্রকার কর্ম্ম যখন ভগবৎসেবায় পর্য্যবসিত হয়, তখনই কর্ম্মের সম্যক্ সার্থকতা, এবং সেই কর্ম্ম বন্ধন সৃষ্টি না করিয়া বরং পূর্ব্বের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেয়, দেহমনবুদ্ধিকে

বিশুদ্ধ ও ভগবদ্ভাবভাবিত করে এবং জ্ঞান প্রেমের বিকাশ করিয়া ভগবৎস্বরূপ সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা সম্পাদন করে। তেমনি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান যখন ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়, তখনই জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পাদন হয়, এবং সর্ব্বত্র ভগবৎস্বরূপানুভূতি হয় ও ভগবৎস্বরূপের ক্রমশঃ পূর্ণতর প্রকাশ উপলব্ধিগোচর হয়। সকল স্নেহমমতা ভালবাসা যখন একীভূত হইয়া ভগবৎপ্রেমে পর্য্যবসিত হয়, তখনই হৃদয়ের সম্যক্ সার্থকতা। তখন সমস্ত প্রাণ যেমন একনিষ্ঠভাবে ভগবানেই মিলিত হয় ও ভগবান্‌কেই আস্বাদন করে, তেমনি সকল জীবের মধ্যে সেই এক ভগবানকেই দর্শন করিয়া সকলেরই প্রতি বিশুদ্ধপ্রেমসম্পন্ন হয় এবং সকলের সেবাতেই ভগবৎসেবানন্দের সম্ভোগ হয়। সমস্ত জীবনটিকে ভগবদ্ভাবভাবিত ভগবদ্‌রসরসাল করিয়া তুলিতে হইবে, ইহাই সাধনা, এবং এই দুই সাধনায় কর্ম্ম জ্ঞান ভজন সকলেই আনু-কূল্য করিবে। এই ভাবেই জীবনটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে পরিচালিত করিতে হইবে। আচার্য্য জগদীশ কোন একদেশদর্শী মতবাদ অবলম্বন না করিয়া জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষবিধানেরই উপদেশ করিতেন। গীতাই তাঁহার পথপ্রদর্শক ছিল, এবং তাঁহার নিজের জীবনটীও গীতারই একখানা জীবন্ত ভাষ্য ছিল। আচার্য্যদেবের অতিশয় প্রিয় একটি শ্লোক দ্বারা প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করি—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম তদপ্যকারণম্॥

---

# শিষ্য সঙ্গে (৩)

জ্ঞানে, প্রতিভায় যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিতে যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে, তাঁহাদের যখন অভাব ঘটে, তখন আমরা সত্যই ক্ষতিগ্রস্ত হই, বেদনা অনুভব করি, শ্রদ্ধায় ও শোকে অশ্রু নিবেদন করি ; কিন্তু যে মহাপুরুষ নীরবে ও গোপনে আপন প্রাণের সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী প্রাণগুলিকে আকর্ষণ করিয়া টানিয়া লন, সকলের আনন্দে, বেদনায়, শোকে, উৎসবে, প্রশ্নে, সমস্যায় যিনি আপনাকে নিঃশেষে বিতরণ করেন, এমনি হাসিয়া—ভালবাসিয়া—যিনি আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া যান, শিক্ষায়, শাসনে ও মধুরতায় যাঁর আসন আমাদের হৃদয়ে অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া যায়, তাঁহাকে যখন আমরা হারাই—বড় তীব্র হইয়া সে অভাব আমাদের অন্তরে আঘাত করে, শূন্যতার বেদনায় হৃদয় হাহাকার করিয়া ওঠে !

জীবনের গতি যাহাদের মুহুর্মুহুঃ বিপর্য্যস্ত হয়, সংসারের মলিনতা ও প্রলোভনের কত ব্যথা, কত জ্বালা অহরহঃ তাহাদের জর্জ্জরিত করে। প্রকাণ্ড ফাঁকির বোঝা লইয়া তাহারা জীবন নদীর পাড়ি জমাইতে তরণী ভাসায়। কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা সে জীর্ণ তরণীর ক্ষীণগতিকে ওলট পালট করিয়া দেয়। এমন অকূলে পড়া মানুষকে যদি তার এই দৈন্য বিপদের মাঝখানে কেহ হাত বাড়াইয়া টানিয়া তোলে, তার নিরাশার অন্ধকারে আশার আলো জ্বালিয়া দেয়, তবে সেই হয় তার সব চেয়ে বড় বান্ধব, জীবনের আশ্রয় ও সান্ত্বনা। পিঠের ভারী বোঝাটা তাঁরই চরণতলে নামাইয়া দিয়া

যেন একটু হাঁফ ছাড়িয়া সে দাঁড়াইতে পারে। ভয়ে, শঙ্কায় শুষ্ক বুকখানা যেন তার সবল হইয়া ওঠে, নিশ্চিন্ত আনন্দে আবার সে পথ চলিতে আরম্ভ করে। আচার্য্যদেব ছিলেন বরিশালবাসীর এমনি প্রাণ, এমনি আশ্রয়, এমনি বান্ধব। তাঁহাকে হারাইয়া বরিশাল আজ সত্যই নিঃস্ব, নিরাশ্রয়।

শিশুবয়স হইতেই আচার্য্যদেবকে দেখিয়াছি। তখন অবাক্ হইয়া থাকিতাম—এত সৌম্য, এত সুন্দর কি মানুষ হয়! দেখিতাম—আমার দিদিমা, মা, দিদি সবাই লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেন, আমিও তাই শ্রদ্ধায় প্রণাম করিতাম কিন্তু তিনি মহাপুরুষ কি দেবতা তাহার সন্ধান করি নাই। তিনি সাধক, তিনি জ্ঞানী, তিনি গম্ভীর অথচ শিশু বৃদ্ধ কেহই তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে অপাত্র বলিয়া বিবেচিত হইত না। যার যতটুকুতে অধিকার তার সঙ্গে ততটুকু লইয়াই তাঁর বেশ আলাপ চলিত। একটু বড় হইলে আমার সঙ্গে তাঁহার প্রথম আলাপ হইল অঙ্ক লইয়া। হঠাৎ একদিন একটা Algebraর formula জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন। সেটা তখনও শেখা হয় নাই, কাজেই হা করিয়া তাকাইয়া রহিলাম। বলিয়া গেলেন 'শিখিয়া রাখিও, আবার জিজ্ঞাসা করিব'। পরম উৎসাহে শিখিলাম ও পরীক্ষা দিয়া তবে নিষ্কৃতি। সেই অবধি শেষ পর্য্যন্ত লেখাপড়ায় কত উৎসাহ দিতেন, কত আনন্দ প্রকাশ করিতেন। কাহারও ভিতরে সামান্য গুণ দেখিলে তাহা প্রশংসায় ও উৎসাহে বাড়াইয়া তুলিতে কতই না চেষ্টা করিতেন। আমার রচনা লেখায় তাঁর ছিল পরম আগ্রহ এবং প্রশংসাও করিতেন অত্যন্ত বেশী। স্কুলে কাজ করি, তাই আমাকে ডাকিতেন 'পণ্ডিত মশাই' বা 'পণ্ডিত দিদি'। কি

পড়াই, কি পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হয়, আমার কষ্ট হয় নাকি, শরীর খারাপ হয় নাকি এ প্রশ্ন যে কতবারই করিতেন। এম্, এ, না পড়িয়া কাজে ঢুকিতে হইল—তাহাতে ছিল তাঁর কত দুঃখ। শেষ পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন—'তোমাকে এম্, এ, পড়িতে হইবে'। সংস্কৃত বি, এ,তে পড়িলাম না— তুই একবার নিতে বলিয়া শেষে বলিলেন—'দিদি এখন কথা শুনলে না, বড় হ'লে এই বুড়োর কথা মনে পড়বে, তখন কিন্তু দুঃখ হবে। যাক্—শেষে পড়ে নিও।' Philosophyর জন্য বলিতেন 'তোমার যখন দরকার হয় আমার কাছে আস্‌বে'। আমি কিন্তু একদিনও যাইতে পারি নাই—এমনি করিয়া সকল বিষয়ে উৎসাহ দিয়া সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিতে তাঁর সর্ব্বদাই চেষ্টা ছিল। আমার দিদি ভাল সেলাই জানেন, তাই তিনি নাম দিলেন 'দরজী মশাই'। যে যাহা সেলাই করিবে দরজী মশাইর পরামর্শ নিতে পাঠাইয়া দিতেন। দিদি গান ভাল-বাসেন, তাই ডাকিতেন 'গানের কুমীর'। সুন্দর নূতন গান কোথাও পাইলে অমনি তাহাকে ডাকিয়া দেখাইয়া শিখিয়া লইতে বলিতেন। ঠাকুরমন্দিরে দিদির সেবাপূজা দেখিয়া ডাকিতেন 'গোঁসাই দিদি'। কত আনন্দ, কত তৃপ্তিই তাহাতে প্রকাশ করিতেন। এমন করিয়া সব কাজে সব জায়গায় যিনি প্রবেশ করেন, ছোট খাট বিষয়ও যাঁর চিন্তা বা দৃষ্টি এড়াইতে পায় নাই, তিনি কি শুধু পূজার দেবতা? এ যে প্রতি পদে দরদভরা মায়ের দৃষ্টি। তাই তো প্রতি পদে সবাই এত অভাবগ্রস্ত।

স্নেহ ভালবাসা খুব বড় জিনিষ, বড় কথা, কিন্তু কৃত্রিমতাও এই জিনিষটির ভিতরেই ধরা পড়িয়া যায় বেশী, স্নেহ যেখানে স্নেহের পাত্রের সামান্য তুষ্টির জন্য আপনার উচ্চপদ, উচ্চমান সমস্ত

ভুলাইয়া দেয় সেইখানেই ফুটিয়া উঠে মায়ের প্রাণ, সেইখানেই স্নেহের পূর্ণতা। আচার্য্যদেবের ছিল এই স্নেহ। আমি খুব চালিতা ভালবাসিতাম জানিয়া প্রায়ই নিজ হাতে বাসার চালিতাগুলি কুড়াইয়া চৌকির নীচে রাখিয়া দিতেন। আমি গেলে বলিতেন—"দিদি, ঐ তোমার জিনিষ নিয়ে যাও'। আর যদি ২।১ দিনে আমি না যাইতাম তবে সে গুলিকে চাদরের নীচে করিয়া বাসায় নিয়া আসিতেন। আমি যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতাম, তেমন ভাবিতাম—এ কেমন মানুষ! স্নেহ তো কতই পাই কিন্তু এত তুচ্ছ বিষয়েও তার এত বড় প্রকাশ কই দেখিনা তো! তখন ভাবিয়াছি বিষয়টা তুচ্ছ, কিন্তু আজ ভাবি স্নেহ যতক্ষণ এমনি তুচ্ছ বিষয়েই ধরা না দেয়, যতক্ষণ বিচারে বিবেচনায় সীমাবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তার সরল রূপটি ফোটেনা। সে স্নেহ মন্ত্রমুগ্ধের মত আকর্ষণও করিতে পারে না, জীবনের কাজেও আসে খুব অল্পই। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রয়োজন মানুষের অনেক সময় শাস্ত্রে, গ্রন্থে, বহু সাধু সজ্জনের উপদেশে মিটিতে পারে কিন্তু প্রাণভরা স্নেহের অভাবে জীবন আমাদের অনেক সময়ই শুষ্ক ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে। শুধুমাত্র আত্মিক কল্যাণ কামনায় যদি এ স্নেহ নিঃশেষ হইয়া যায় তবে ক্ষুধা তৃষ্ণার জীব আমরা—সে স্নেহ আমাদের তৃপ্তি দিতে পারে কই? অন্তর বাহিরের সকল প্রয়োজনেই যদি তার ব্যাকুল দৃষ্টি না পাই তবে প্রাণে সরসতা জাগে কোথায়? বাহিরের প্রয়োজনগুলিকে তো ছোট বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বড় কথা জীবনে অনেক সময়ই ব্যর্থ হইয়া যায় কিন্তু ঐ ছোট জিনিষ-গুলির প্রতিটী স্মৃতি যে অন্তরে দাগ কাটিয়া যায়, তাহাকে তো ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না, জীবনের পরম সম্পদ বলিয়া

স্বীকার না করিয়া তো পারি না। হয়ত বা এইগুলিই আমাকে অন্তরের পথে আস্তে আস্তে ঠেলিয়া লইয়া চলিবে। এমন স্নেহটিই আচার্য্যদেবের নিকট হইতে পাইয়াছি, তাই বুঝিতেও পারিয়াছি—স্নেহ মানুষের জীবনে কত বড় প্রয়োজন। জিনিষের বা কাজের বড় ছোট বোধ তাঁহার স্নেহকে কোনদিন মাপ দিতে দেখি নাই। আমার দিদি একটা গান চাহিয়াছিলেন, সেটা নিজে হাতে লিখিয়া নিজের হাতে বাসায় পৌছাইয়া দিয়া তবে তাঁহার ছুটী। আমাদের রুগ্ন শরীর সে যে তাঁর কত কষ্ট, কতই যে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন তাহার স্মৃতি আজ চক্ষের জলেরই পরিমাণ বাড়ায়।

কিন্তু এ স্নেহ শুধু তাঁর খাওয়াইয়া খুসী করিয়াই শেষ হইত না। আমাদের চলাফেরা বা ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনোমত এবং আমাদের মঙ্গলজনক না হইলে তাহাও বলিয়া দিতেন। মেয়েদের সাজ পোষাকের বিলাসিতাটুকু লক্ষ্য করাইয়া দিতে ছাড়িতেন না। হঠাৎ আমাকে একদিন বলিয়া ফেলিলেন—"মণি, তুই তো একেবারে মণিবাবু হয়ে গেছিস্, না?" আমি তো অবাক্, বলিলাম, কেন? আমার হাতখানা টানিয়া লইয়া সোনার চুড়ীগুলি নাড়িয়া দেখাইয়া বলিলেন "এই যে চুড়ী, হার কত কি,—কত টাকা, কত পয়সা তোর গায়ে দেখিস্ না, তবে তুই বাবু না তো কি?" লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেলাম। একটু পরে বলিলেন, 'দিদি, এগুলো তুই ছাড়্‌বি কবে বল্‌তে পারিস্?" কি উত্তর দিলাম মনে নাই। পরে বলিয়াছিলেন, "মনথেকে ছেড়ে দিও, আর অল্প করে' গয়না দিও।" আমার মাথার অনেক চুল তাঁর একটা যন্ত্রণার সামগ্রী ছিল। মেয়েদের চুল স্বভাবতঃ একটা সৌন্দর্য্য বা লক্ষ্মীশ্রী বলিয়া সকলেই মনে করেন। কিন্তু শুধু মাত্র যন্ত্রণা বোধ করিতে আমি

এই একটি মানুষকেই দেখিয়াছি। আমার প্রকাণ্ড খোলা চুল চোখে পড়িলেই বলিতেন—'এগুলো কেটে ফেল্‌তে পারিস্‌না। কেন মিছেমিছি বোঝা বয়ে কষ্ট পাও?' আমি বল্‌তাম—'লোকে বল্‌বে কি?' বলিতেন, 'তাতে কি? লোকের কথায় কি হয়?' ভাবিতাম ইনি কি জানেন না আমাদের মেয়ে জাতটা এই চুলের জন্যই কত পয়সা খরচ করে? বড় পাড়ের কাপড় পড়িয়া গেলে অমনিই তাহা লক্ষ্য করিতেন। বলিতেন "দিদি, তোমরা কাপড় পরনা, পাড়ই পর বুঝি?" এই সব কথা অন্যে বলিলে হয় তো রাগ করিতাম কিন্তু তাঁহার কথা তীব্র হইয়া মনকে কখনও বিদ্রোহী করে নাই; মিষ্টি হইয়া তাহাকে সহজেই পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। মেয়েদের অদ্ভুত লজ্জা তিনি পছন্দ করিতেন না। রৌদ্র বৃষ্টিতে ছাতা লইয়া যাইতে আমরা লজ্জা বোধ করিলে—বলিতেন, 'এতে তোমাদের লজ্জা'! নিজে ছাতা দিয়া 'যাও' বলিয়া পাঠাইয়া দিতেন, দ্বিরুক্তি করিবার সাধ্য থাকিতনা। মাকে একদিন বলিয়াছিলেন—'মা, বুকের ভিতর ভগবানকে রেখে, তাঁর কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে রাস্তা দিয়ে চলে যাবে, তাহ'লে দেখ্‌বে আর লোক লাগবে না। ভয় কিসের?'

এই হাসি, আনন্দের মেশামিশির মধ্যেও তাঁর এমন একটা গাম্ভীর্য্য, এমন একটা ব্যক্তিত্ব হিমাচলের মত দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকিত, মাতৃস্নেহের সঙ্গে এমন একটা বিরাটত্ব মিশ্রিত থাকিত যে, সেখানে সাহস করিয়া সব কথা বলা চলিত না। অনেক দিন অনেক কথা বলিব বলিয়া ভাবিয়া গিয়াছি কিন্তু দুই একটি কথাতেই আমার সব চুরমার হইয়া যাইত। তিনি কেন খাওয়া দাওয়ায় অত শুচিতা বজায় রাখিতেন এই লইয়া ঝগড়া করিতে আমরা প্রস্তুত হইয়া

যাইতাম কিন্তু ধারাল যুক্তিগুলি নিক্ষেপ করিবার আগেই আমার মুখ বন্ধ হইয়া যাইত। দিদি তবু কিছু বলিতে পারিতেন কিন্তু উত্তরে তিনি এমন করিয়াই হাসিতেন যে, তারপরে আমাদের আর কিছু বলার থাকিত না। মাকে মাঝে মাঝে বলিতেন, 'আমি সবই পারি কিন্তু তোমাদের দশজনের জন্যই আমাব এ সঙ্কোচ।'

এমন গম্ভীর পুরুষ আবার যখন হাসি গল্প করিতেন তখন বালকের মতই মধু হইয়া যাইতেন। আমার দিদিকে একদিন বলিলেন, 'ইন্দু, বলতো স্বর্গ কোথায়?' দিদি বলিলেন, "এই কাছেই, দেহটা সুস্থ থাকলেই স্বর্গ।" বলিলেন, "ঠিক বলেছ, রোগের যন্ত্রণাই বলতে পাবি—নবক যন্ত্রনা। দিদি, আরও এক জায়গায় স্বর্গ আছে, আমি বলতে পারি। এই বরিশালের নদীর তীরের বড় রাস্তায় যখন বেড়াই, পাশে ঝাউবন থাকে, তখন কিন্তু স্বর্গেব মতই লাগে।" আর একদিন বলিলেন, 'ইন্দু তোমারও দাঁতে ব্যথা, আমারও দাঁতে ব্যথা, তুমি আমার দাঁতাল ভাই।' সবাইকে বলিলেন, 'তোমরা সব চুপ কর, আমি আর ইন্দু এখন শুধু দাঁতের কথাই বলব, আর কোন কথাই নয়।" সবাই তো হাসিয়া অস্থির। এমনি সরল হাসির ঝরণা যে কতই বহিয়া যাইত!

কিন্তু সব আলাপ আলোচনার মধ্যে ভগবৎ আলোচনাতেই ছিল তাঁর পরম আগ্রহ ও অফুরন্ত আনন্দ। যদি কিছু প্রশ্ন করিতাম বা কোন কিছু বুঝিতে চাহিতাম তবে কত স্নেহে, কত আদরে, কত রকমেই যে সে জিনিষটিকে বুঝাইয়া দিতেন, যেন কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হয় না। একবার গীতা বুঝাইতে বলায় রোজ নিয়মিত সময়ে গীতাখানা হাতে করিয়া বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তাহাতে একদিনও ভুল হইত না। এই সকল আলোচনার ভিতরে দেখিয়াছি,

শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিতে গিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে যেন শতমুখ, শতকণ্ঠ হইয়া যাইতেন। মাঝে মাঝে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিত। অপূর্ব্ব শ্রী মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিত। বুঝিতাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জীবন। একদিন প্রশ্ন করিলাম 'গীতার পরে ভাগবতের আর প্রয়োজন কি? গীতায় তো অপূর্ণতা কিছু নাই। প্রেম ভক্তির সাধনার পরাকাষ্ঠা কি গীতায় নাই? ভগবন্নির্দ্দিষ্ট পন্থার পরে আর ভক্তের অনুভূতির কি প্রয়োজন?' অনেক করিয়া আমাকে বুঝাইলেন কিন্তু কিছুতেই যখন স্বীকার করিয়া লইতেছিলামনা তখন একটা ধমক দিয়া বলিলেন, 'দাঁত ওঠে নাই তো, কচি আমের আস্বাদ কি বুঝবে? আগে দাঁত উঠুক পরে দেখবে।' সে ধমকের পরে, সে দৃপ্ত চোখের সামনে আর আমার কথা বলিবার সাহস ছিল না। কিন্তু এই মেরুদণ্ডহীন বাঙ্গালী জাতির বাঁচিবার জন্য তিনি যে বস্তুর প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন, তাহার প্রকাশ পাইলাম আর একদিনের কথায়। ঢাকায় তখন হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা চলিতেছিল, সেই সময় একদিন আমাদের বাসার মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া বলিতেছিলেন, "রাত্রে ঘুমাইতে পারি না'। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, 'যে সমস্ত সংবাদ রোজ কাণে আসে তাহাতে আতঙ্ক হয়।' জিজ্ঞাসা করা হইল, এই মৃত জাতির বাঁচিবার জন্য আপনার জীবনব্যাপী সাধনায় কি অমৃত লাভ করিয়াছেন তাহাই বলুন। বলিলেন—**'তোমরা এখন বাঁশীর কৃষ্ণ ছেড়ে দেও, পার্থ সারথির উপাসনা কর।'** সে দিন বুঝিলাম, জাতির জন্য কি পুঞ্জীভূত বেদনা তাঁহার অন্তরে ছিল, আর জাতির শক্তিই বা তিনি কোন্ জায়গায় খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন।

আচার্য্য দেব বড় ছিলেন, উচ্চ ছিলেন, দেবতার মত সকলে

তাঁহাকে দেখিত, কিন্তু দেবতা হইয়া মানুষের অঞ্জলি তিনি কোনদিনই গ্রহণ করেন নাই। মা অনেকদিন তাঁহার পায়ে ফুল দিতে তিনি হাত পাতিয়া সে ফুল লইয়া ভগবানের চরণে অপনিই নিবেদন করিয়া দিতেন। মানুষের সবটুকু শ্রদ্ধা প্রকাশের সুযোগ তিনি কাহাকেও দিতেন না। আপনার গৌরবে, আপনার মর্য্যাদায় তিনি সাধারণের ধরা ছোওয়ার সীমানা ছাড়াইয়া নিজেকে কোথাও প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। দিদি একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আচ্ছা, লোকে যে গুরুপূজা করে আপনার তাতে মত কি?" বলিলেন, 'তোমার আমার তাতে কি প্রয়োজন, তুমি যা করিতেছ তাই করিয়া যাও।' জোর করিয়া জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, 'দিদি, ভগবানের আসন আর নাই, পৃথিবীতে ভগবানের আসন উঠে গেছে।' জানিনা, হয়তো কেহ আবার তাঁহার চরণে অঞ্জলি দিয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতার অঞ্জলিকে লঘু করিয়া ফেলিবে এই জন্যই আচার্য্য-দেবের এত শঙ্কা, এত দীনতা। মাকে বলিতেন, 'মা, মনটা শুদ্ধ কর, তা হলেই সব হবে, আর কিছুর প্রয়োজন নাই।' ভগবানকে দূরে রাখিয়া তাঁহার কোন কথাই ছিলনা। মা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'পরলোকে কি প্রিয়জনকে আবার পাওয়া যায়'? উত্তর দিলেন, 'ভগবানের ভিতর দিয়ে পাবার চেষ্টা করবে, তা'হলেই পাবে, নতুবা নয়।' আপনার থাকিবার দালানটিকে উৎসর্গ করিলেন শ্রীকৃষ্ণের নামে। দালানের গায়ে 'গোপাল গোবিন্দ' লেখা দেখিয়া মা তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন—'গোপাল অর্থে ভগবানের জীব এবং গোবিন্দ অর্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই দুইএর সেবার জন্যই এ বাড়ী থাকবে'। আচার্য্যদেব সমুদ্র, তাঁহাকে পরিমাপ করিবার শক্তি তো আমার নাই কিন্তু তাঁহার স্নেহের আকর্ষণ
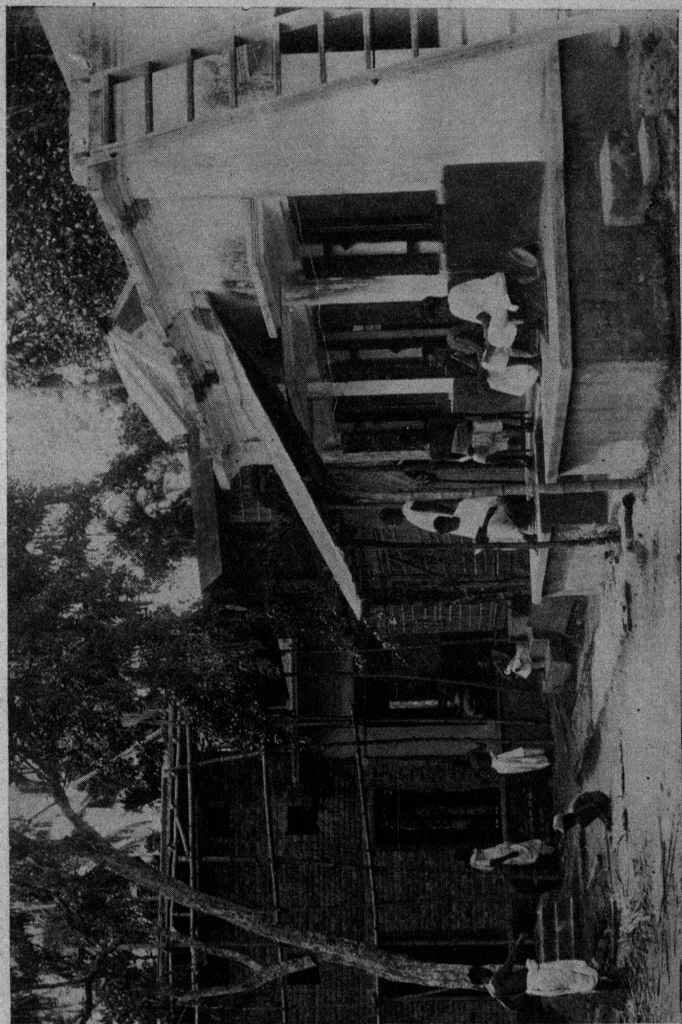
জগদীশাশ্রম, বরিশাল

বিদ্রোহীকে বশীভূত করে এবং তাঁহার শ্রীকৃষ্ণবিশ্বাস অবিশ্বাসীকে শুদ্ধ করে—এইটুকু বুঝিয়াছি।

দেবতা, তুমি কি ছিলে কাহাকেও জানিতে দেও নাই। নিজেকে শুধু গোপনই তুমি কর নাই, বিলোপ করাই ছিল তোমার চেষ্টা। বিলোপ তুমি করিয়াছ কিন্তু সে বিলুপ্ত প্রাণের মধুগন্ধ যে সকলকে পাগল করিয়া চতুর্দ্দিকে জনসমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকে তো প্রতিরোধ করিতে পার নাই! আপন প্রাণের অন্তরালে বসিয়া জীবনসুধা আপনি পান করিবে, দানের অহঙ্কারে পা বাড়াইবেনা, এই ছিল তোমার সঙ্কল্প, কিন্তু সবাই যে তোমাকে লুটিয়া নিল, কই, ঠেকাইতে তো পার নাই! তোমার এ বিলোপের সাধনা যে মধুচক্র সৃষ্টি করিয়া সকলকে আকর্ষণ করিয়া লইত। এত মধুরতা, এত স্নেহ, এত আনন্দ, এত প্রেম, এতবড় মাতৃহৃদয় যদি তোমার ভিতরে না পাইতাম তবে তোমার ঐ বিশাল স্বর্গীয় হৃদয়ে আমাদের প্রবেশের পথ ছিল কোথায়? তোমাকে বুঝিতে পারি নাই, বুঝিবার ক্ষমতাও নাই কিন্তু জীবনে তোমার স্নেহ, তোমার আশীর্ব্বাদ, তোমার স্পর্শ আমার বড় সম্পদ। তোমার গোপনের সাধনা শেষ করিয়া আজ তুমি চক্ষুর অন্তরালে, কিন্তু সেখান হইতেও তোমার স্পর্শের সম্পদে যেন বঞ্চিত না হই। তোমার ক্ষমা-সুন্দর, ধ্যান-গম্ভীর মূর্ত্তির আকর্ষণ যেন এখনও আমাকে পাগল করে।

---

# অন্তরঙ্গ সঙ্গে

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদাচার্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় গত ১৩৩৯ সনের ২৪শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, ইংরাজি ১৯৩২ সনের ১০ই নবেম্বর বেলা অপরাহ্ণ ৩-২০ মিনিটের সময় মানবলীলা সম্বরণ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। এই মহাপুরুষকে আমরা জগদীশবাবু না বলিয়া 'Sir' বলিয়া সম্বোধন করিতাম সুতরাং এখনও সেই সম্বোধনই করিব।

ইংরাজি ১৮৮৫ সনের শেষভাগে চাকরীর অনুসন্ধানে বরিশাল যাই। তৎপূর্ব্বেই বোধ হয় ১৮৮৪ সনে Sir বরিশাল আসেন। ঐ সময় আমার জ্ঞাতিভ্রাতা স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ও বি, এম, স্কুলে মাষ্টার হইয়া যান, তিনি Sirএর সহিত একবাসায় থাকিতেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর উপলক্ষেই তাহাদের বাসায় যাইতাম। ক্রমে জগদীশবাবুর সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপ হইতে থাকে ও বন্ধুভাব জন্মে এবং শীঘ্রই তাহা সখ্যভাবে পরিণত হয়; সৌভাগ্যক্রমে সেই সখ্যভাবের উপর গুরুশিষ্যভাব আসিয়া দাঁড়ায়। তিনি হ'লেন গুরু, আমি হইলাম শিষ্য। সেই সময় বি, এম, স্কুলের নিকটেই ২।৩ জায়গায় জগদীশবাবু বাসা পরিবর্ত্তন করেন। আমিও ঐ স্কুলের নিকটবর্ত্তী এক বাসায় থাকিতাম এবং সন্ধ্যার পরই আহারাদি সমাপন করিয়া Sirএর নিকট হাজির হইতাম অথবা কোন দিন বা বড়কর্ত্তা (পরম পূজনীয় ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত) মহাশয়ের নিকট যাইয়া নানা সৎপ্রসঙ্গ শুনিতাম।

এই সময় নববিধান সমাজভুক্ত ৺কালীকুমার বসু ঠাকুর বরিশাল

কালেক্টরীর হেড ক্লার্ক ছিলেন এবং তাহার একটী নববিধানের ব্রাহ্মসমাজ ছিল। সেই সমাজে বি, এম, স্কুলের শিক্ষক কালীপ্রসন্নবাবু, জগদীশবাবু, এবং রাখালবাবু, নিয়মিতরূপে রবিবার সন্ধ্যার পর যাইতেন, সুতরাং আমিও যাইতাম, এবং শীঘ্রই ঐ সমাজের সঙ্গীতের দলে প্রবেশ করিলাম। এই ভাবে কিছুকাল কাটিয়া গেল এবং কালীপ্রসন্নবাবু কাউনিয়াতে পৃথক বাসা কবিলেন। এই সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত স্বনামধন্য স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয়ের উদ্যোগে কালীপ্রসন্নবাবুর বাসায় প্রতি রবিবার দুপুরের সময় কালীপ্রসন্নবাবু, জগদীশবাবু, রাখালবাবু এবং মনোরঞ্জনবাবু একত্রিত হইয়া পঞ্চদশী প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনা করিতেন। মনে হয় মাষ্টার ৺অক্ষয়কুমার সেনও এই সমিতিতে যোগ দিতেন।

আমি ঐ সমবেত লোকদের মধ্যে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বয়সে এবং সর্ব্বপ্রকারেই নিম্নশ্রেণীর লোক হইলেও এক কিনারায় যাইয়া বসিতাম এবং দেখিতাম যে সমিতি ভঙ্গ হইলেও Sir আমার সহিত স্নেহভরে কিছু আলাপ ব্যবহার করিতেন। Sirএর সহিত আমার বেশী ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ পরিচয় হইতে থাকে ঐ সব সমাজ এবং সমিতি-ভঙ্গের অনেক পর। এদিকে আবার মহল্লার কালীবাড়ীতে সিদ্ধ মহাপুরুষ ৺সনাতন ঠাকুরের খ্যাতি খুব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। স্বর্গীয় মোক্তার শ্রদ্ধেয় ৺প্যারীমোহন গুহ মহাশয় প্রথম আমাকে ঐ ঠাকুরের নিকট নিয়া আলাপ করাইয়া দেন। তদবধি প্রায় প্রত্যহই কাছারীর পর কালীবাড়ীতে এক বৈঠক দিতাম। মাঝে মাঝে Sirও তথায় যাইতে লাগিলেন। এইরূপে কতককাল কাটিয়া গেলে পর শেষে প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার পর Sirএর বাসায় যাইতে

লাগিলাম এবং ঐ সময় ওখানে মস্ত এক বৈঠক বসিতে লাগিল। যার যে বিষয়ে সংশয় হইত Sir তাহা মিটাইয়া দিতেন। এই আনন্দের হাট সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৯।১০টা পর্য্যন্ত থাকিত। কোন কোন দিন রবিবার প্রাতে যাহা পাঠ করিতেন তাহারই আবার বিস্তৃত আলোচনা হইত। কালীবাড়ীর ঠাকুরের কথা Sir বলিতেন যে "ইনি নিরক্ষর মানুষ কিন্তু ইনি যা বলেন তা পাই শেষে বেদান্ত উপনিষদে।"

আমি পেনসন নিয়া আসিলে প্রত্যেক বৈশাখ মাসে একবার বরিশাল যাইতাম এবং কালীপ্রসন্নবাবুর লোকান্তর গমনের পর Sirএর বাসায়ই যাইয়া থাকিতাম, তাহাতে তিনি বড় আনন্দিত হইতেন। একস্থানে সাম্‌নাসাম্‌নি আহার করিতে বসিতাম, তাহাতে Sir প্রায়ই বড় আনন্দ প্রকাশ করিতেন। আবার প্রায়ই এটুক ওটুক যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন। বলিতেন "ধর ধর অন্নদা! একটু তুমি খাও"। ২।১ দিন ধমক দিতাম—বলিতাম "আপনি এত বড় লোক হইয়া কিরূপে প্রয়োজনাতিরিক্ত আহার গ্রহণ করিতে বলেন?" তখন বলিতেন "আরে খাও, অসুখ করিবে না", আমিও নিঃশঙ্কচিত্তে খাইতাম, কোন উদ্বেগ হইত না। ইহার পর আমিও Sir দুপুর বেলায় বাসায় ফিরিবার পূর্ব্বেই আহারকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলাম কিন্তু তা'হলেও এড়াইবার যো নাই, কারণ বাহির হওয়ার কালেই কেহকে বলিয়া যাইতেন "অন্নদাকে এটুক ওটুক দিও"।

এদিকে ভালবাসিতেন এত কিন্তু সামান্য একটু অন্যায় দেখিলে তাহা পছন্দ করিতেন না। একদিন দুপুরবেলা বাসায় ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"অন্নদা আহার হয়েছে?" আমি উত্তর

করিলাম—"আজ্ঞে হাঁ, সেবা হয়েছে।" Sir বল্লেন "কার সেবা কল্লে?" আমি বলিলাম "এই দেহটার অথবা দেহ মধ্যে যিনি আছেন।" প্রশ্ন—সত্য সত্যই কি তাহার সেবা করেছ? উত্তর—আজ্ঞে না। তিনি বল্লেন, তবে এই নিরেট মিথ্যাটা কেন বল্লে? উত্তর—একটু রগড় করিয়া বলিয়াছি, আর বলিব না। একদিন আমরা কয়েকজন Sirএর অনুপস্থিতিতে সন্ধ্যার পর বসিয়া নানা গল্প গুজব করিতেছি, তন্মধ্যে একজন ঐ যে একটা গান আছে "কেন বঞ্চিত হব চরণে, আমি কত আশা করে বসে আছি পাব জীবনে না হয় মরণে" ঐ গানটার অনুকরণে মাঝে মাঝে হাস্যোদ্দীপক পদ বসাইয়া—যথা "কেন বঞ্চিত হব ভোজনে"—বেশ আমোদ করিতেছিলেন। আমি কিন্তু ঐ আমোদে যোগ দিতে না পারিয়া চুপ করিয়াছিলাম। অল্প সময় মধ্যেই Sir বাসায় আসিলে ঐ গানটী গাওয়া হইল কিন্তু Sir মন্দ বলিলেন। বলিলেন একি? অমন একটা সুন্দর গানের সর্ব্বনাশ করা হচ্ছে, আর কি ঐ গানটী গাহিয়া কেহ আনন্দ পাবে?

Sir কালীবাড়ীর ঠাকুরের খুব ভক্ত ছিলেন। সেই ঠাকুরের একটা দোষ ছিল—বাসায় বসিয়া যাহা করিতাম অথবা তাহার ওখানে যাইয়া যাহা মনে ভাবিতাম, ঠাকুর তাহা জানিতে পারিতেন, কাজেই কিছু চিন্তা করিতেও ভয় হইত। অতি দুরেও একজন কেমন আছে, কি করিতেছে, তাহা বলিতে পারিতেন। তবে তাহার এই বিদ্যা বেশী লোকে টের পায় নাই। Sirএরও সেই দোষটুকু জন্মিয়াছিল, তাহা আমি বেশ টের পাইয়াছি, আর কেহ পাইয়াছেন কিনা জানিনা। সাধকগণ এ সকল বিভূতি অতি সাবধানে গোপন করেন। লোকে জানিলে ত্যক্ত করে বিশেষতঃ

অনেকে এ সকল বিভূতির মোহে পড়িয়া খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঠাকুর এবং Sir দয়া করিয়া আমাকে জানিতে দিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম।

কালীবাড়ীর ঠাকুর দিন তারিখ সময় ঠিক করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। যে রাত্রির শেষভাগে দেহ রক্ষা করেন সেই রাত্রিরই প্রথমভাগে ১১টা পর্য্যন্ত আমরা তিনজন ঠাকুরের নিকট ছিলাম কিন্তু ঐ রাত্রিশেষেই যে দেহত্যাগ করিবেন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম না।

১৩৩৮ সনের বৈশাখ মাসে যখন Sirএর নিকট বিদায় নিয়া আমি বাড়ী যাই, তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, Sir আবার কি দেখা হবে? তিনি উত্তর করিলেন "হবে।" এই কথা বাড়ীতে আসিয়া মেয়েলোকদের নিকট বলিয়াছিলাম। ঐ ১৩৩৮ সনের শ্রাবণ মাসে আমাব সঙ্কটাপন্ন পীড়া হয়। আমি রোগমুক্ত হইয়া শুনিলাম আমার দ্বিতীয় পুত্রবধূটী বলিয়াছিল, "এবার ঠাকুরের কিছু হইবে না কারণ জগদীশবাবু যখন বলিয়াছেন যে আবার দেখা হ'বে, তখন তাঁর সঙ্গে আবার দেখা না হইতে ঠাকুরের কিছু হইতে পারে না।" আমার পুত্রবধূটীর বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। ১৩৩৯ সনের বৈশাখ মাসে আবার বরিশাল গিয়াছিলাম, আসিবার দিন সন্ধ্যা বেলা Sirকে বলিলাম "আজ বাড়ী যাব।" Sir বলিলেন "কেন? আজ হঠাৎ বাড়ী যাওয়ার কি দরকার হইল?" আসার সময় যখন শেষ পায়ের ধূলা নিলাম তখন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম "আবার কি দেখা হবে?" কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তা কি করিয়া বলা যায়, শরীরটা ত

মোটেই ভাল থাকিতেছে না"। এই বলিয়াই পাশ ফিরিয়া শুইলেন। আমার চোখে জল আসিল, ঐ ভাবেই চলিয়া আসিলাম। Sir এর প্রেম এবং ভালবাসার কথা বলিয়া বুঝানও যায় না, শেষও করা যায় না।

একদিন বড়কর্ত্তার (পূজ্যপাদ ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত) নিকট Sir (জগদীশবাবু), আমি এবং আরও যেন কে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছি এমন সময় ২টী বৈরাগী আসিয়া গোপীযন্ত্র এবং মন্দিরা বাজাইয়া গান ধরিল—

ঝাঁপ দিয়ে রসের সাগরে, কেউ ভাসে কেউ ডুবে মরে।
রতন থাকে অগাধ জলে, ডুবুরিতে ডুবে তোলে,
তাও কি মিলে যার তার কপালে;
সাঁতার ভুলে ডুবলে পরে দম্ ঠেকে বুক ফেটে মরে।
সাপ্ খেলাতে জানে যারা, তারা জানে ফণী ধরা,
মণি পেয়ে ধনী হয় তারা;
বেহুঁস যারা পায়না তারা, দংশনে ঢলে পড়ে।
নামে প্রেমে মাখা যেমন, কামে প্রেমে মাখা তেমন,
রসিক জানে রসের আস্বাদন;
রাজহংস হ'লে, কলে কৌশলে, জল ফেলে দুধ পান করে।
বেহার বলে সেই জলে, ত্রিবেণীতে স্নান করিলে,
জন্ম মৃত্যু যায় এককালে;
সে যে গুরুপদে নেহার দিয়ে বসে থাকে আর রূপ নেহারে।

বৈরাগীদ্বয় বিদায় হইলে পর বড়কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কেউ বা ভাসে কেন, আর কেউ বা ডুবে মরে কেন? বড়কর্ত্তা Sirকে বলিলেন "জগা, তুই বল্"। Sir বলিলেন "আপনি বলুন"। বড়কর্ত্তা

বলিলেন "আরে তুই বল্ দেখি শুনি ; বাঁশের থেকে এখন কঞ্চি দড় ( দৃঢ় ) হইয়াছে" অর্থাৎ গুরু অপেক্ষা শিষ্যই অধিক শক্তিশালী হইয়াছে। তখন Sir বলিতে আরম্ভ করিলেন, ( যতদূর মনে হয় তাই লিখিতেছি ) "যাহারা সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ-প্রণালী সম্যক্ অবগত আছেন তাহারাই মণি লাভ করিতে পারেন, তা না হলে যারা অজ্ঞ তারা মণি লাভ করা দূরের কথা আরো বিপরীত ফল লাভ করে। কুণ্ডলিনী শক্তি নাভিমূলে মণিপুর পদ্ম পর্য্যন্ত উঠিয়া সুষম্নার মধ্যের সূক্ষ্ম নালদ্বারা বিদ্যুতের মত সহস্রারে যদি উঠে তবেই সাধক কৃতার্থ হইতে পারে। আমার মনে হয় তখনই সাধক গাহিয়া উঠেন 'প্রভু মহারাজ একি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে।' তখনই সাধক অনুভব করেন 'কেবলই শুধু আনন্দ সুন্দর বিরাজে।' কিন্তু মণিপুর হইতে বক্রগতিতে যাওয়ারও বেশ সুগম পথ আছে, যদি শক্তি সেই পথে যায় তবেই মুস্কিল, তা হলেই পতনের আশঙ্কা, কারণ তা হলেই কাম উদ্দীপন হয়। কাজেই নামের সহিত প্রেমের যেমন সম্বন্ধ তেমনই প্রেমের সহিত কামেরও সম্বন্ধ আছে।" এ কথার অনেক পর Sir একদিন আমাকে চুপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে কোন একজন ভক্ত তাহাকে নাকি বলিয়াছিলেন যে "কীর্ত্তনান্তে অনেক সময় কামের উদ্রেক হয়।" Sir বলিলেন ইহাই শক্তি বিপথগামী হওয়ার ফল।

একদিন বৈকালে খুব বৃষ্টি হইতেছে, Sir তাহার খাটখানার উপর শুইয়া আছেন, আমি ছোট চৌকীখানার উপর বসিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। শেষে শ্বাসের ক্রিয়া বিষয়ে অনেক কথা হইতে Sir বলিলেন "আরে দেখ এ রকমও হইতে পারে" এই বলিয়া আমার হাত টানিয়া নিয়া পেটের উপর রাখিলেন।

দেখিলাম নাভিমূলের নীচ হইতে শ্বাস উঠানামা করিতেছে। নাভির উপরি ভাগে কোন ক্রিয়া নাই। আমি ত অবাক। কেমন আত্ম-গোপন করিয়া চলিতেছেন তাহা বুঝিলাম। ভগবানের কৃপায় সাধু সন্ন্যাসী কিছু যে না দেখিয়াছি তা নয়, এমন প্রেমিক বৈরাগী ত আর দেখি নাই! তাই এক একবার মনে হয় অশ্বিনীকুমার, জগদীশ, কালীপ্রসন্ন, কালীশ, রাখাল প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যানন্দ অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস প্রভৃতির অভিনয় করিয়া গেলেন নাকি?

Sir আপোষ ঝগড়া করিতে বেশ আমোদ পাইতেন। কড়া জবাব পাইলেই খুসি হইতেন এবং চুপ করিতেন। কড়া জবাব দিতে পটু ছিলেন শশী চাটার্জ্জী, তার পর আমিও নিতান্ত কম নহি। সূর্য্য-বাবু ধমকও দিতেন। একদিন ভোর হওয়ার একটু পূর্ব্বে আমি গাহিতেছিলাম—"আমি সকল কাজের পাইহে সময় তোমাকে ডাকিতে পাইনে, আমি কতই কি খাই ভস্ম আর ছাই তোমার প্রেমামৃত খাইনে' ইত্যাদি। প্রাতে যখন চা খাইতে বসিয়াছি তখন আমি বলিলাম আজ Sirএর উঠিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে। অমনি বলিলেন "না—তুমি যখন ছাই ভস্মগুলি খাইতেছিলে তখনই ত আমি বাহিরে গিয়াছি।" তৎপব চাএর সঙ্গে Sir যাহা খাইতেছিলেন তাহার একটু নিয়া বলিলেন "অন্নদা! ধর ধর একটু খাইয়া দেখ দেখি, আমার পাকটা কেমন হইয়াছে।" আমিও হাত পাতিয়া নিয়া বলিলাম তবে এখন একটু প্রেমামৃত খাওয়া যাক।

Sirএর স্বহিত ঠাট্টা বিদ্রূপ ইয়ারকি যথেষ্ট ছিল, শেষকালে আমার উপবীত তিনিই দিয়াছিলেন। শাসনের ত্রুটি ছিলনা। একদিন পৈতা গাছটী মালার মত গলায় রাখিয়াছি। Sirএর নজর ওদিকে গিয়াছে। বল্লেন 'অন্নদা তোমার গলায় ওটা কিহে? আমি কি

তোমার গলায় একটা মালা পরাইয়া দিয়াছিলাম?' তখন আর কি করি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৈতাটা সমান করিয়া গলায় দিলাম এবং তদবধি আর পৈতাটী মালার মত রাখি নাই। বরিশাল থাকিতে একদিন Sirকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। ঐদিন পণ্ডিত মহাশয়ের বাসা হইতেও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল কিন্তু বন্দোবস্ত হইল যে ঐদিন আমার বাসায়ই খাইবেন, তৎপর দিন পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় খাইবেন। খাওয়ার দিন বেলা বারটা বাজে তবু Sir আসেন না। তখন আমি আমার এক ছেলেকে বলিলাম খবর নিতে যে ব্যাপার কি হইল। এমন সময় Sir আসিয়া বলিলেন "বেলা হওয়াতে তোমাদের কষ্ট হইয়াছে। একখানা বই পড়তে পড়তে আর বেলার খেয়াল ছিল না।" আমি বলিলাম "বইখানা বোধ হয় বেদান্ত।" Sir বলিলেন "ঠিক ধরেছ।" শেষে শুনিলাম Sirএর দুর্দ্দশা। বেশী বেলা হয়েছে হঠাৎ খেয়াল হওয়াতে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া পাকের ঘরে গিয়াছেন, তখন পাচক চায় চাকরের মুখের দিকে, চাকর চায় ঠাকুরের মুখের দিকে। পাচক বলিল "আপনারত পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল।" অমনি পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় গিয়াছেন, সেখানে তাহারা বলেন "আজত অন্নদা বাবুর বাসায় খাবেন"। তখন আবার আমার বাসায় ছুট। আদত কথা মাথায় ঐ বেদান্তের ঝোঁকই ছিল।

Sir গোপনে গোপনে যে কত ভালবাসিতেন তাহা ত বলিয়া শেষ করা যায় না। একবার সপরিবারে কাশী গিয়াছিলাম। ৺অশ্বিনীকুমার বলিয়াছিলেন, জগদীশের মায়ের মত অমন একটী মেয়ে লোক আর দেখি নাই সুতরাং কিসের বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শন, আগেই Sirএর মাকে দেখা দরকার। কাশী যাওয়ার পর দিনই Sirএর মাকে দেখিতে গেলাম। যাইয়া নাম বলিয়া প্রণাম করা মাত্রই

বলিলেন "তুমি অন্নদা, তুমি বরিশাল হইতে আসিয়াছ?" আমি বলিলাম, আজ্ঞে আমি সম্প্রতি বাড়ী হইতে আসিয়াছি। "আচ্ছা খোকা বস, তোমার কথা জগদীশ লিখিয়াছে" আমি ত অবাক। "খোকা ধর এই আমটি খাও", আমি আমটী নিয়া উঠিয়া একটু দূরে যাওয়ার উপক্রম করা মাত্রই বলিলেন "না খোকা এখানে বসিয়া খাও, একটু ফেলবে ত মার খাবে।" মায়ের কাশী প্রাপ্তির খবর Sir ৭।১।২৪ তারিখে কাশী হইতে লিখিতেছেন "মা ১০ই পৌষ ১০টা বেলায় মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তিনি বলিতেন আমি উত্তরায়নে যাইব। একদিন পৌষের প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন এ কোন্ মাসের কোন্ তারিখ? আমি বলিলাম ৯ই পৌষ মঙ্গলবার উত্তরায়ন হইবে। সেই দিন হইতে উদর ভঙ্গ হয় এবং পরদিনই প্রস্থান করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় ১৫ দিন আর কাহারও সহিত বড় একটা সম্পর্ক রাখিতেন না। সর্ব্বদা বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। মৃত্যুর প্রায় ৮।১০ মিনিট পূর্ব্বে আমাকে কাছে বসিতে বলেন। আমি ভাল আছি কিনা ও পেটের ব্যথাটি ভাল হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সময় নিকট বলিয়া কানে ওঁ নাম শুনাইতে লাগিলাম, তিনিও আমার সঙ্গে বলিতে লাগিলেন। গলা কাঁপিতে লাগিল, ক্রমে বিলম্বে কাঁপিল, শেষে দীপ নির্ব্বাণের মত আর কাঁপিল না। যখন গীতা পড়িয়া শুনাইতাম তখন হইতে ওঁ নামের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। শারীরিক বেদনার মধ্যে উহু বলিয়া না কোঁকাইয়া "ওঁ" বলিয়া কোঁকাইতেন। আমি বলিয়া দিয়াছিলাম "মা! বেদনার অর্থ এই যে তোমার অন্নপূর্ণা মা তোমার প্রাণটাকে আস্তে আস্তে হাড় মাস হইতে খসাইয়া বাবা বিশ্বনাথের হাতে দিতেছেন"। তিনি সেই কথাই ভাবিতেন। * * *।"

Sir যখন প্রাতে ধ্যান করিয়া আসিতেন তখন মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিত। একটী বিধবা মেয়ে Sirএর নিকট গীতা অধ্যয়ন করিত। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন অন্নদা এই মেয়েটীকে চেন? আমি বলিলাম আমি কি করিয়া চিনিব? তখন পরিচয় দিলেন "এইটী তোমার ২য় পক্ষের গুরুভগ্নী"। আমি কথাটা বুঝিতে পারিয়াও পরিষ্কার করিবার জন্য বলিলাম ইহাকে বলে কোন্ দেশীয় পরিচয়? তখন বল্লেন এইটি অমুক এবং তোমার দ্বিতীয় গুরু শ্রীমৎ তীর্থ স্বামীজীর শিষ্যা। আমি বলিলাম তাহলে ৩য় পক্ষের গুরুভগ্নী বল্লেই ক্ষতি কি? ঐ মেয়েটি হলো Sirএর ছাত্রী এবং Sir হইলেন আমার ৩য় গুরু। কাজেই ৩য় পক্ষের গুরুভগ্নীও বলা যায়।

আমার অভাব বা প্রয়োজন আমাপেক্ষা Sir বেশী বুঝিতেন। একবার হুকা কল্কি নিয়াছিলাম না। যাওয়া মাত্রই অনুসন্ধান। অমনিই বলিলেন অমুক স্থানে হুকা কল্কি আছে, কিছু তামাক টীকা আনিয়া নেও। আমি বলিলাম "প্রয়োজন হবে না"। সে কথা কে শোনে? তামাক খাওয়ার সব যোগাড় হইলে পর তবে ঠাণ্ডা।

একদিন দুপুর বেলায় কায়স্থ কনফারেন্সে যাব। Sir বল্লেন খাওয়া দাওয়ার পরই এই রোদের মধ্যে যাইতে হইবে, একখানা গাড়ী করিয়া যাও। আমি বলিলাম "হাঁটিয়াই যাইতে পারিব।" কনফারেন্সে যাওয়ার অল্প পরই মাথা ঘুরাইতে এবং বমি বমি করিতে আরম্ভ হইল। গাড়ী করিয়া বাসায় আসিলাম। তখন কথা অমান্য করার জন্য একটু মিষ্ট ভৎর্সনা করিলেন এবং আমার সেই গুরু-ভগ্নী এবং আর একটী মেয়েকে বলিলেন "তোমরা যাইয়া অন্নদাকে

একটু বাতাস দেও, একটু ঘুম হইলেই সারিয়া যাইবে।" Sirএর কথা অমান্য করিয়া যে কাজ করিয়াছি তাহাতেই আমার অশুভ হইয়াছে।

বরিশালের সিবিল সার্জ্জন রায় আনন্দ লাল বসু বাহাদুর এবং কলিকাতা হইতে আগত এক জন Local auditor এই দুই জনই আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, আপনারা জগদীশ বাবুর আশ্রিত আপনাদের খুব সৌভাগ্য বশতঃই এই সঙ্গ লাভ করিয়াছেন। জগদীশ বাবুর আশ্রিত বিধায় আমরা আনন্দ বাবুর নিকট যথেষ্ট অনুগ্রহ পাইয়াছি।

ক্রমান্বয়ে ২।৩ জন লোকের নিকট শুনিলাম যে Sir শ্রীমৎস্বামী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী হইতে স্বপ্নে সাধন পাইয়াছেন বা মন্ত্র পাইয়াছেন; তাই আমি একদিন Sirকে জিজ্ঞাসা করিলাম "অমুক অমুকে বলে যে আপনি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট স্বপ্নে মন্ত্র পাইয়াছেন—কথাটা সত্য কিনা?" Sir বলিলেন "কৈ আমিত কিছু জানিনা।" আমি বলিলাম "তবে লোকে বলে কেন?" উত্তর হইল " তাহারা কেন বলেন তা আমি কি করিয়া বলিব?"

Sir এর বিবাহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "আমার বিবাহের কথা হইলেই পলাইতাম। একবার একটী ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া আমার নিকট অনেক কান্নাকাটা করাতে বলিয়াছিলাম, যদি এত দিনের মধ্যে আপনার মেয়ের বিবাহ না হয় তবে আমি বিবাহ করিতে পারি, কিন্তু মেয়ের ভরণপোষণ আপনারই করতে হবে।" কিন্তু ভগবানের কৃপায় যে সময়ের কথা বলিয়াছিলাম ঐ সময় মধ্যেই মেয়েটীর অন্যত্র বিবাহ হইয়া গেল। আর একবার কাশীতে বসিয়া মাকে বলিলাম, মা একবার বাড়ী চলনা? মা বলিলেন, সকলের পুত্রবধূ থাকে, নাতি পুতি থাকে, সেই টানে তারা যায়, আমার কে আছে? আমি কোন্

টানে যাব? তখন মাকে বলিলাম আমি বিবাহ না করাতে যদি তোমার মনে কষ্ট হইয়া থাকে তবে আগামী কল্য মধ্যে তুমি বল, আমি বিবাহ করিব। কথাটা বলিয়া আমার মাথা দিয়া যেন আগুন ছুটিল, তখন মনে হইতে লাগিল, এ কি করিলাম? কাশীতে বসিয়া মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা। যদি মা বলেন তবে বিবাহ করিতেই হইবে। বিধির বিধান চমৎকার! পরদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা কি আদেশ কর? কিন্তু মা বল্লেন "দেখ্, লোকে ছেলে বিবাহ করায় ছেলের সুখের জন্য, সেই বিবাহে তোর যদি অসুখ হয় তবে তাতে আমার কোন্ সুখ হবে? আমি তোকে বিবাহ করতে বলতে পারিনা"। Sir বলিলেন "মায়ের কথা শুনিয়া আমি হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।" এখানে আমরা বলিতে পারি যে অমন মায়ের পেটেই এরূপ ছেলে হয়।

Sir বলিয়াছেন ইন্দুর মৃত্যুর পর মাকে লিখিলাম মা, এখনত তুমি আর আমি, হয় তুমি বরিশালে আমার নিকটে আস, না হয় আমাকে তোমার নিকট কাশীতে যাইতে অনুমতি দেও, আমরা একস্থানে থাকি। তাহার উত্তরে মা লিখিলেন—বরিশালের লোক তোমাকে চায়, তুমি বরিশাল ছাড়িয়া আসিলে তারা বড় ব্যথা পাইবে। সুতরাং তোমার কাশীতে আসার দরকার নাই। আমি বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মতলে যেমন আছি তেমনই থাকিব।

ব্যক্তিগত চিঠি পত্রের কথা আর না লিখিয়া ,Sir রবিবার এবং বাসায় অন্য সময় যাহা বলিয়াছেন তন্মধ্যে যাহা মনে আছে অথবা লিখিত আছে তাহারই ২।৪টী কথা উল্লেখ করা যাউক।
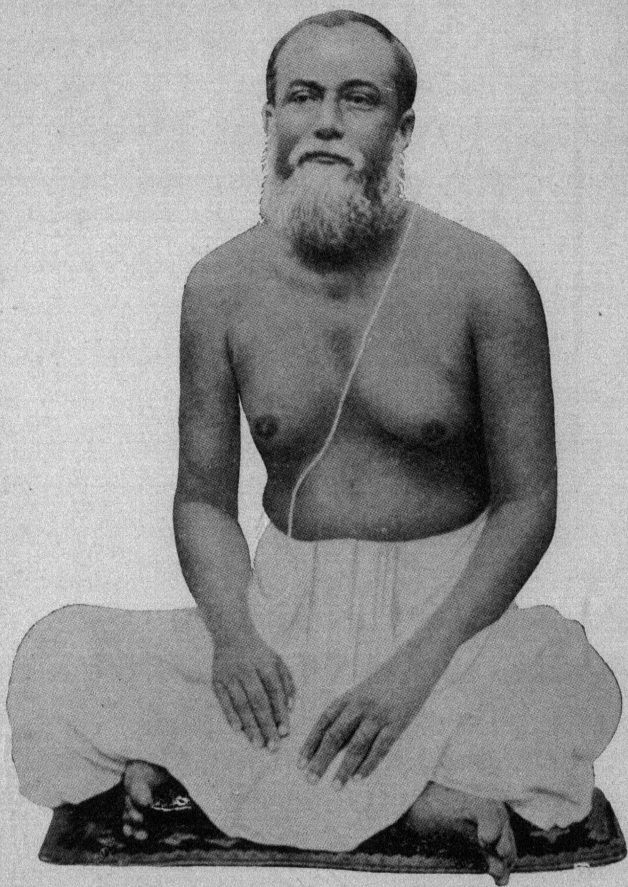
আশ্রমে জগদীশ

শ্রীমদ্ভাগবতে গজকচ্ছপের আখ্যায়িকা আছে তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় বলেন যে গজ আর কেহই নহে, কেবল জীবের অহঙ্কার মাত্র। জীবের মোহকেই কুম্ভীর রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। জীব অহঙ্কার বশতঃই মোহগর্ত্তে পতিত হয়, কিছুতেই নিস্তার নাই কিন্তু যখন ভগবানের শরণাপন্ন হয় তখনই তাহার উদ্ধার, নচেৎ নিজের বলে বলীয়ান মনে করিলে তাহা হয় না। ভগবানের কৃপা ভিন্ন কিছু হওয়ার নয়।

১৩১৭ সনের ৮ই শ্রাবণ রবিবার। Sir শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বস্ত্র হরণ পাঠ করিয়া বুঝাইলেন যে এমন একটী শ্লোক নাই যাহাতে কোনরূপ কাম গন্ধ আছে। কেবল ভগবানের প্রতি গোপীগণের ভক্তির পরাকাষ্ঠাই ইহাতে প্রকাশ পায়। দেহ মন সমস্তই ভগবানের এবং সমস্ত তাহাকে অর্পণ করিলেই তাহার হওয়া যায়। Sir বৈকালের সান্ধ্য সমিতিতে বলেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যোগেশ্বর, মহাদেব অমন নিষ্কলঙ্ক কিন্তু ইহাদের চরিত্রে নাকি কত দোষারোপ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ জীব উদ্ধার করিতে আসিয়া নাকি লাম্পট্যের শেষ সীমা দেখাইয়া গিয়াছেন। আর মহাদেব যিনি কটাক্ষে মদন ভস্ম করিয়াছিলেন তাহার নাকি কুৎসিৎ ব্যাধি পর্য্যন্ত হইয়াছিল। বাস্তবিক লোকে আপন প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে দেবতা গঠন করিয়া লয়।

প্রশ্ন—ভগবান নিরাকার অথচ হিন্দু ব্রাহ্ম সকল সমাজেই ভগবানের চরণ উল্লেখ করা হয় কেন?

উত্তর—চরণ উল্লেখ করিলেই ভগবানের প্রতি দাস্য ভাব প্রকাশ পায়।

১০ই শ্রাবণ রাত্রি—বিহারীবাবু মাষ্টার প্রভৃতি উপস্থিত; Sir প্রশ্ন করেন সর্ব্বত্রই যদি ব্রহ্ম দর্শন হয় এবং ব্রাহ্মীস্থিতি হয় তবে

বিরহ ব্যাপার কিরূপে সম্ভবে? সেদিন এ কথার কোন উত্তর হয় না। Sir বলেন "চক্ষু বুজিলেই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণার মত জ্যোতি দেখা যায়, পরে শরীর মন স্থির হইলে দপ্ করিয়া উজ্জ্বল আলো জ্বলিয়া উঠে। সে আলোর উপমা নাই।" বিহারীবাবু বলিলেন "একথা এখন শুনিলাম, যদি এই ধারণা হইতে কল্পনাতেই আলো দেখি?" Sir বলিলেন "সত্য আলো পৃথক, তার গায় ছাপ মারা আছে। কল্পনার আলো এবং প্রকৃত আলো বুঝা যায়। অন্তকোষ তৈলাধার, বীর্য্যই তৈলস্বরূপ, সূক্ষ্ম শিরারূপ শলীতা দ্বারা ঐ তৈল আকর্ষিত হইয়া সহস্রারে উঠিলেই দিব্য আলো দেখা যায়। সে আলোর তুলনা নাই, অতি স্নিগ্ধ, অতি নির্ম্মল।"

আর একদিন বলেন—"সহস্রারে যে সূর্য্য উদয় হয় তন্মধ্যেই নিজ ইষ্ট মূর্ত্তি দেখা যায়।"

১৬ই শ্রাবণ রাত্রি

Sir বলেন "প্রজাদের নিকট হইতে টাকা পাইলাম না, কি অমুক আমার কতক ভূমি নিয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করিতে নাই। চাহিয়া যাহা পাওয়া যায় দানে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পাইয়াছি। মায়ের কৃপা অজস্র বর্ষণ হইতেছে। যেরূপ রাখিয়াছেন, বেশ রাখিয়াছেন এরূপ মনে করিতে হয়, অনেক বিষয় উপেক্ষা করিতে হয় নচেৎ শান্তি আসে না। কেহ যদি কিছু নেয়, কি পাওনাটা না দেয় তবে মনে করিতে হইবে পাওনা রহিল অথবা দেনা শোধ দিলাম।"

যাহাতে শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম হয় তাহাই করিতে হয়। আসন প্রাণায়াম না করিলে অভ্যাস দৃঢ় ও স্থায়ী হয় না। তাহার উপর আম্মোক্তারনামা দিতে হয়, নচেৎ শান্তি কোথায়?

## ২৯শে শ্রাবণ রবিবার, ১৩১৭

প্রাতে রাসলীলা পাঠ হয় তাহাতে গোপীদের ভগবানের প্রতি প্রেম ব্যাখ্যা হয়। ভগবান প্রত্যেকের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। কিন্তু যখনই অহঙ্কারের উদ্রেক হয়, তখনই তিনি অন্তর্দ্ধান হন। রাসলীলা কেবল আধ্যাত্মিক ব্যাপার মাত্র কারণ গোপীরা সেই সময় নিজ ঘরেই শয়ান ছিলেন। ভগবান যোগমায়া আশ্রয় করিয়া তাহাদের সহিত এই লীলা করেন।

বৈকালে Sirএর সহিত কথা হয়। শাক্ত বৈষ্ণব সকল সাধন মধ্যেই দেখা যায় তিনটী থাক্ আছে যথা ভগবান, গুরু এবং জীব (সাধক)। ঈশ্বর, খৃষ্ট এবং খৃষ্টান। লোকে গুরুর ধ্যান করে কারণ ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। নিজে মলিন কিন্তু গুরু আদর্শ স্বরূপ। এই প্রণালী হইতে খৃষ্টের উপাসনা হয়। যদি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হয় যে আমাকে ভাল কর তবে কি বুঝাবে? একটা আদর্শ থাকিবে যে অমুকের মত কর। বৈষ্ণবদের মতে শ্রীরাধিকাই আদর্শ, সুতরাং তিনিই গুরু। তারপর অন্যভাবে দেখা যায় যখন কোন সাধকের চিত্ত ভগবানের প্রতি আসক্ত থাকে তখন এক অবস্থা, আবার যখন বিষয় ব্যাপারে মগ্ন থাকে তখন এক অবস্থা। তখন ঐ পূর্ব্বাবস্থার জন্য লালসা হয়। এখানে ভগবান ও জীবের শুদ্ধ ও মলিন ২টী অবস্থা ধরিয়া তিনটী অবস্থা দেখা যায়। মোটের উপর জিনিষ তিনই এক, কেবল অবস্থার ভিন্নতা মাত্র।

## ৪ঠা ভাদ্র শনিবার রাত্রি

Sir বলেন যে বন্ধন তিন প্রকার। ১ম—পরিবারের প্রতি এমন আসক্তি যে এ সকল স্ত্রীপুত্র না থাকিলে পর অভাব বোধ হয়, ইহা

তামস। ২য়—এরূপ বোধ যে আমি না থাকিলে কে ইহাদের প্রতি দৃষ্টি করিবে, ইহা রাজস। ৩য়—এ সকল পরিবার হইতে একটু স্বতন্ত্র থাকিতে না পারিলে কিছু হবে না, একটু আলগা হইতে হয় ইত্যাদি—৩য় বন্ধন। প্রথম ও দ্বিতীয় বন্ধন অতিক্রম করিতে না পারিলে তৃতীয় বন্ধনকে বন্ধন বলিয়া মনে হয় না বরং ইহাই মুক্তি বলিয়া মনে হয়। যদি এরূপ বোধ হয় যে স্ত্রী না থাকিলে কে আমার উপযোগী আহারাদি বন্দোবস্ত করিবে, কে আমার তত্ত্বাবধান করিবে, যদি এরূপই হয় তবে স্ত্রীর প্রতি মাতৃভাব হইয়াছে মনে করিলেই হয় এবং তাহার সহিত ঐ পর্য্যন্ত সম্পর্ক রাখিলে হয়।

চুপ করিয়া থাকাই ভাল। শুনা অনেক হইয়াছে। কেবল শুনিলে কি হয়, একটু হজম করা দরকার।

একটী পণ্ডিতের নিকট কেহ ঋণ চাহিতে গিয়াছিল। পণ্ডিত বলিলেন, আমি ৫০৲ টাকা ধার দিতে পারিব কিন্তু ৷৷০ আনার বেশী সুদ দিতে পারিব না। তাহার বিশ্বাস ছিল যে ধার দিলে দক্ষিণা স্বরূপ কিছু সুদও দিতে হয়।

## ৬ই ভাদ্র সোমবার রাত্রি

Sir বলিলেন ৫টী ইন্দ্রিয়, যথা শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা। শাস্ত্রবাক্য এবং গুরুবাক্যে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে, এবং এই বিশ্বাসের বলে সাহস হয়। বিশ্বাস থাকিলে যে কোন কার্য্যে সাহস হয়, ইহাকেই বীর্য্য বলে। তারপর নিজের জীবনে কি করিলাম না করিলাম, ইহা পর্য্যালোচনা করার নাম স্মৃতি এবং নিগূঢ় চিন্তা হইলেই সমাধি আসে। সমাধি লাভ হইলেই আর একটা জ্ঞান

খুলিয়া যায়, তখন নূতন ব্যাপার অন্তরে জাগরিত হয়, তখনই প্রজ্ঞা লাভ হয়। মনে নানা বাসনা কামনা আসে কিন্তু প্রজ্ঞা সেই সকল বাসনা কামনা সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলে। এই সমাধি ও প্রজ্ঞা দৃঢ় হইলেই অভীষ্ট বস্তু লাভ হয়।

১৯শে ভাদ্র রবিবার ( বৌদ্ধ গ্রন্থ )

কর্ম্মই আত্মার পুনর্জন্মের হেতু। আমের আঁঠি হইতে যেমন গাছ হইয়া আম হয় তদ্রূপ যে কর্ম্মগুলি সঞ্চিত থাকে তাহা হইতেই আবার জন্ম হয়।

না জানিয়া যে পাপ করে, তাহা অপেক্ষা জানিয়া যে পাপ করে সে উত্তম, কারণ এ কার্য্যে পাপ জানিলে অনুতাপ আসে কিন্তু যে জানে না যে এ কার্য্যে পাপ তাহার উহা জানিতেই কতক সময় লাগিবে সুতরাং যে জ্ঞানকৃত পাপ করে তাহার সংশোধনের উপায় শীঘ্র হয়।

নাগসেন বলেন অতীত বিষয়ের জন্যও শোক করিবেনা, ভবিষ্যতের জন্যও নয় এবং বর্ত্তমানের জন্যও নয় কিন্তু বর্ত্তমানে এরূপ কোনও কার্য্য করিবে না যাহাতে ভবিষ্যতে ক্লেশ হয়।

প্রস্তর অপেক্ষা কাষ্ঠ হাল্কা। প্রস্তর নিজে নদী পার হইয়া যাইতে পারে না কিন্তু নৌকার সাহায্যে পরপারে অনায়াসে যাইতে পারে। এইরূপ গুরুর সাহায্যে পরপারে যাওয়া সহজ।

গল্প—একজন একটী পদ্মফুল বিষ্ণুচরণে দিয়াছিল, তাহার জীবনে ঐ একটী মাত্র পুণ্য ছিল। মৃত্যুর পর যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তখন চিত্রগুপ্তের পরামর্শানুসারে সে বলে যে প্রথমে পুণ্যের ফলভোগ করিবে। তদনুসারে স্বর্গে নিয়া যাওয়ার সময় রাস্তায় একটী পদ্মবন

দেখিয়া অসংখ্য পদ্ম বিষ্ণুচরণে দিতে লাগিল সুতরাং তাহার আর নরকে যাওয়া হইল না।

পাঁচটী উপায় দ্বারা পাপ নষ্ট করা যায়—(১) ভোগ (২) প্রায়শ্চিত্ত (৩) অনুতাপ (৪) উপাসনা (৫) ব্রহ্মজ্ঞান।

Sir পাঠ করেন—ভগবানের মায়াতেই জীব আবদ্ধ আছে। সেই মায়ার অধীশ্বরকে ভজনা করিলেই সেই মায়া কাটান যায় নচেৎ অন্য উপায় নাই। পূজ্যপাদ অশ্বিনীকুমার বলেন যে তিনি এমন মায়া দিলেন কেন? এখনই বা তাহার ভজনা করিব কেন? পরে ঠিক হয় যে তাহার (অশ্বিনীকুমারের) সহিত পরামর্শ না করিয়া কার্য্য করাতেই এরূপ ভুল হইয়াছিল।

১লা আশ্বিন রবিবার রাত্রি

প্রথম আসার সময় শ্বাসপ্রশ্বাস প্রাণরূপে দেখা দেয়। যাওয়ার সময়ও শেষ পর্য্যন্ত ইহার সহিতই দেখাশুনা থাকে। বাক্য লয় হয় মনে, মন লয় হয় প্রাণে। শ্বাসরূপে এই প্রাণ বহির্গত হয়। মৃত্যুর সময় একটা অজ্ঞানতা আসে সুতরাং শ্বাস প্রশ্বাসে নাম নেওয়ার অভ্যাস হওয়া খুব ভাল। অজপা চলিতেছে, ইহার সহিত নাম যোগ করিয়া দিলেই হয়।

উত্তম ভাগবত যিনি, তিনি সকলের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করিবেন। সুতরাং ভিক্ষার্থী বৈরাগী বৈষ্ণবদিগকে কটু বলা দূরে থাকুক অবজ্ঞাও করিবে না। বিশেষতঃ পঞ্চসূনাজনিত পাপ ক্ষালনার্থ পঞ্চ যজ্ঞের বিধান আছে। ব্রহ্মযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ। কিছু দেওয়া কি খাওয়ান নৃযজ্ঞের মধ্যে। ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয় হয়, ক্ষত্রিয়ও ব্রাহ্মণ হয় যথা দ্রোণাচার্য্য, বিশ্বামিত্র।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

Sir কথাপ্রসঙ্গে বলেন—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, সকল ধর্ম্মাবলম্বীই জপ করিয়া থাকেন, সুতরাং নাম জপটী সকলের অনুমোদিত এবং ভাল সাধন বলা যায়। নাম জপের প্রণালী কি তাহা দেখিতে হইবে। যখন কোন প্রস্তর ইত্যাদি জিনিষে তৈয়ারী মূর্ত্তিতে ঈশ্বরবুদ্ধি স্থাপন করা যায়, তখন তাহাতে আরোপ বলা যায়। ইহা ভিন্ন নিরাকার প্রতীকও হইতে পারে, তাহাকে অভিধান বলে, তাহা দুই প্রকার যথা সগুণ ও নির্গুণ। যখন ভগবানকে পিতা মাতা সখা ইত্যাদি বলিয়া ডাকা হয়, তখন সগুণভাবে ডাকা হয়। তৎপর নির্গুণকে ডাকিতে যাইয়াও প্রতীক অবলম্বন এবং প্রতীক ভিন্ন হইতে পারে। যথা ওঁ প্রণব উচ্চারণে তাঁহাকে ডাকা গেল। (১ম) ওঙ্কারই ব্রহ্ম এরূপ মনে করিয়া যে প্রণব উচ্চারণ করা হইল তাহাতে প্রতীক অবলম্বন করা হইল। এখানে প্রণবই তাহার প্রতীক হইল। (২য়) যখন এইটী মনে করা হয় যে প্রণব উচ্চারণে সেই ত্রিগুণাতীত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে ডাকা হইল, প্রণব সেই অখণ্ডের একটী নাম মাত্র, এই সময় প্রতীক অবলম্বন করা হইল না, কারণ প্রণব উচ্চারণ করিলে উহার অতিরিক্ত অন্য আর একটী জিনিষ বুঝিতে হইবে। জগদীশ বলিয়া ডাকিলাম, মনে করিলাম যে জগদীশই আমার লক্ষ্য, তিনিই সকল। ইহাতে জগদীশ প্রতীক হইল। কিন্তু জগদীশ বলিলে যদি আর একজন মানুষ লক্ষ্য থাকে তবে জগদীশ শব্দটী তাহাকে ডাকার অবলম্বন মাত্র হইল কিন্তু প্রতীক হইল না।

## বৃহদারণ্যক ব্যাখ্যা

আত্মাকে প্রতীক করিয়া যে ডাকা হয় অথবা ধ্যান ধারণা করা হয় তাহা মোক্ষের অনুকূল এবং ইহাকে প্রতীক উপাসনা বলা যায় না, কারণ আত্মা নিজেই চিন্ময় পদার্থ।

২১শে শ্রাবণ, ১৩৩৩

মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব এবং মহাপুরুষের আশ্রয়, এই তিনটী জীবনের সার। অজ্ঞান, অরুচি, অনিচ্ছা এবং অক্ষমতা, এই চারিটী মৃত্যুব লক্ষণ। অশ্বমেধযজ্ঞকারী ব্যক্তি সূর্য্য চন্দ্র ইত্যাদি লোক ভেদ করিয়া অন্ধকারের পরপারে অপর লোকে বায়ুতে মিশিয়া যাইয়া ব্রহ্ম লাভ করে। সাধারণ দেহকে অশ্ব ( অর্থাৎ কল্য যে থাকিবে না ) জ্ঞান করিয়া তাহা দ্বারা যজ্ঞ করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মে অর্পণ করিয়াই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভাগী হইতে পারে।

গাছের যেমন বীজ পোড়াইয়া ফেলিলে এবং যে গুড়ি উঠে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিলে আর গাছের জন্ম হয় না, তেমনি মানুষেরও বাসনা-বীজ নষ্ট হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। বাসনাই পুনর্জন্মের বীজ।

সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া নিগুর্ণ ব্রহ্মে পৌছিতে না পারিলে মানুষ জন্ম বৃথা। নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইলে মন, প্রাণ, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি কোন প্রতীক অবলম্বন করিতেই হইবে। কিন্তু এই প্রতীকই ব্রহ্ম নহেন তাহাও মনে রাখিতে হইবে।

পরোপকার ইত্যাদি কার্য্য করিলে খুব আনন্দময় স্থান লাভ হয়, যিনি ব্রহ্মকে আশ্রয় করেন তিনি তাহাকেই পান। এখন যে সমস্ত কার্য্য ও চিন্তা করা হইতেছে তাহা আদিত্যগণ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছেন, এই অনুযায়ী ভবিষ্যৎ জীবন নির্ম্মিত হইবে।

২রা ভাদ্র, ১৩৩৩

Sir কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে সংযমই প্রধান সাধন। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলের মধ্যেই সংযমের ব্যবস্থা। মুসলমানেরা ৩০ দিন রোজা করে, খৃষ্টানেরা ৪০ দিন সংযম করে। হিন্দুরা সকল কার্য্যেই সংযমের ব্যবস্থা করে। শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের পূর্ব্বদিন সংযম করিতে হয়। সংযমী লোক সুস্থ এবং দীর্ঘজীবী। যখন কোন জাতির মধ্যে সংযমের অভাব হইয়া বিলাসিতার প্রভাব হয়, তখনই সেই জাতির পতন হয়। কোন বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে তাহারা মিতব্যয়ী, সকল কার্য্যে সংযম আছে। যে পরিবারের অধঃপতন দেখা যায় তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় তাহারা বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। নিজের সুখ ভোগের প্রতিই লক্ষ্য, অন্যের প্রতি লক্ষ্যই নাই। তাহারা নিজের স্বার্থই দেখিবে, অন্যের দিকে চাহিতে সময় হবে না। যাহারা সংযমী তাহারা সময়ের ব্যবহার জানে, কোন প্রলোভনের বস্তু উপস্থিত হইলে সংযমী লোক পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায় কিন্তু অসংযমী লোক তাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। সংযমী লোক অন্যের দোষ দেখিলে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া শান্তিলাভ করে। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে সংযম প্রত্যেক কার্য্যেই দরকার নচেৎ শান্তি সুখ লাভের আশা করা যায় না। কেহ বলিবে এত বৎসর সাধন নিয়াছি, কিছু হইতেছে না। সংযমের অভাবই কিছু না হওয়ার কারণ।

উপনিষদে সঞ্চিত, প্রারব্ধ এবং ক্রিয়মান—তিন প্রকার কর্ম্মের উল্লেখ আছে। বহু জন্মের যে সংস্কার তাহা সঞ্চিত, ঠিক পূর্ব্ব

জন্মের কর্ম্মফল প্রারব্ধ এবং বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্মকে ক্রিয়মান বলা যায়।

পূজ্যপাদ Sir বলিলেন একটী প্রকাণ্ড হ্রদ আছে, তাহার জল স্থিরভাবে আছে। সেই হ্রদের এক পাশ দিয়া একটি খাল কাটা হইয়াছে। হ্রদের মধ্য হইতে যে খালের মুখে জল প্রবেশ করিতেছে সেই স্থানের জলগুলি খালের মুখে আলোড়ন করিতেছে। খালের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া নানাগতিতে বেগে জলগুলি চলিতেছে। প্রকাণ্ড হ্রদের যে জলগুলি স্থিরভাবে আছে তাহা সঞ্চিত কর্ম্ম। ঠিক খালের মুখে প্রবেশ করিতে যে জল নড়িতেছে ইহাই ঠিক পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম এবং প্রারব্ধ বলা যায়। খালের মধ্যের জলগুলিতে তরঙ্গ এবং গতি আছে সুতরাং তাহা ক্রিয়মান বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সঞ্চিত এবং ক্রিয়মান কর্ম্মের শেষ হয় কিন্তু প্রারব্ধ ভোগ করিতেই হইবে। ইহাকেই বলে 'ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।' দূরে একটি ব্যাঘ্র দেখিয়া বাণ ছাড়া হইয়াছে, তূণে আরও বাণ আছে। বাণ ছাড়িয়া দেখা গেল ওটি ব্যাঘ্র নহে, গরু। এখন ওটা যে প্রকৃত গরু তাহার জ্ঞান হইল সত্য কিন্তু নিক্ষিপ্ত বাণ আর ফিরাইবার সাধ্য নাই। জ্ঞান প্রভাবে অন্য বাণ প্রয়োগ না করাতে ক্রিয়মান কর্ম্মের শেষ হইল এবং সঞ্চিত বাণগুলিরও ব্যবহার হইল না কিন্তু নিক্ষিপ্ত বাণের ফল ভোগ করিতেই হইবে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানী লোকেরও ক্যান্‌সার হওয়া কি অন্য কোন ভোগ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন নচেৎ মুক্তির আশা বৃথা।

একটী বিষয় প্রথম পরম পূজ্যপাদ Sir এর নিকট অবগত হইলাম। যাহারা সাবিত্রীদীক্ষা গ্রহণ করে তাহাদের আর অন্য

দীক্ষার প্রয়োজন নাই। কিন্তু অনেক দিন পর আমার পত্রোত্তরে ৯-৯-৩০ তারিখে লিখিয়াছিলেন, "বেদান্ত ব্রহ্মকে সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ বলেন। সাংখ্যে এক ব্রহ্ম স্থলে বহু মুক্ত পুরুষ স্বীকার করে এবং প্রত্যেক মুক্ত আত্মা ব্রহ্মের ন্যায় ভূমা। তবে সাংখ্যের আত্মা কেবল চৈতন্য মাত্র তাহাতে আনন্দ নাই। তন্ত্রসকলও সাংখ্যমত আশ্রয় করিয়া আনন্দ অংশ বর্দ্ধিত করিয়া ব্রহ্ম ভাবনা করে। সাবিত্রী দীক্ষায় যে ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ আছে তাহা বেদান্ত অনুযায়ী, সুতরাং তিনি সচ্চিদানন্দরূপী, কিন্তু মোক্ষার্থী ইহারও পরে শুদ্ধ চিন্ময় আত্মার স্বরূপ লাভ করিতে গিয়া ২য় দীক্ষার প্রতীক্ষা করেন'।

কাশীতে হিন্দু মহাসভায় এক মন্তব্য গৃহীত হয়—"যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনা করেন তাহাদের উচিত তাহাদের সন্তানগণের উপনয়ন শাস্ত্রানুসারে অষ্টম বর্ষেই দিবেন।" আমি Sirকে জিজ্ঞাসা করি যে ৮ম বৎসরের বালক উপনয়নের কি বুঝে? তদুত্তরে Sir ১৭-১-২৯ তারিখে লেখেন "বৃদ্ধ কামিনী পণ্ডিত মহাশয় গত ১২ই পৌষ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন এখন বুঝি আমার পালা?—যখন অষ্টম বর্ষে উপনয়ন হইত তখন মাতৃভাষা সংস্কৃতই ছিল, বিশেষতঃ ত্রিবর্ণের। অত শৈশব হইতে প্রাণায়াম শিক্ষা ও শুদ্ধ আহার আচরণ হইতে থাকিলে দীর্ঘায়ু না হওয়ার কারণ নাই। হিন্দুর সদাচার কেবল ইন্দ্রিয় নির্য্যাতন নহে, উহা ইন্দ্রিয় সংযম, সেই সংযম যত শীঘ্র আরম্ভ হয় ততই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল হয়। * * * *"

একদিন বলেন "বড় পরাধীন হইয়া পড়িয়াছি"। আমি বলিলাম "কিসে এত পরাধীন মনে করেন?" অন্য লোক আসিল, আর

কথা হইল না। Sir যে কত ভালবাসিতেন তাহা কি আর লিখিয়া প্রকাশ করা যায়? Sirএর নিজ হাতের লেখা শেষ পত্রখানা হইতে একটু লিখিয়া ক্ষান্ত করিব।

বরিশাল, ২৫শে চৈত্র, ১৩৩৮

"** যে শরীর লইয়া কলিকাতা ও মধুপুরে গিয়াছিলাম তাহার বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। লাভের মধ্যে দুটী চক্ষুই প্রায় অন্ধ লইয়া ফিরিয়াছি। এই পত্র অতিকষ্টে লিখিতে পারিতেছি। *** তুমি যদি গ্রীষ্মের বন্ধে আসিতে পার তবে সুখী হই। তাহার পূর্ব্বেও আমার কোন অসুবিধা নাই। **"

Sir যে কি নিয়া আনন্দ করিবেন ঠিক পাইতেন না, একদিন বলেন "এ বাসায় ননীই কেবল অন্নদার বন্ধু"। আমিও বলিলাম "তবে এখন হইতে বলব যে Sir আমার দুধটুক গরম করিয়া দেন, এটুক কি ওটুক করেন" তখন চুপ। শেষকালে লক্ষ্য করিয়াছি যে একটী গান Sir খুব ভালবাসিতেন। গানটী এই—"মরি হায় কি অপরূপ ঐ কালরূপ আমি বড় ভালবাসি।" এই গানটী করিলেই Sirকে আর পাওয়া যাইত না, তিনি যেন কোথায় চলিয়া যাইতেন। এক এক জনের এক এক গান লক্ষ্য করিয়াছি—কালীবাড়ীর ঠাকুরের ছিল "মাগো মা জয় কালী নাম সেই তোমার**", ৺অশ্বিনী কুমারের ছিল "কত গুণের তুমি আমার প্রেমময় হরি।" কালীশ পণ্ডিত মহাশয়ের ছিল "জগৎ জোড়া হরির মেলা"। Sirএর ছিল "মরি হায় কি অপরূপ ইত্যাদি।"

Sir একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—বল দেখি অন্নদা, ঈশ্বর আছেন এ কথার প্রমাণ কি? আমি না ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিয়া ফেলিলাম "আমি আছি" ইহাই বড় প্রমাণ। তখন বলিলেন, ঠিক বলেছ।

একদিন বলেন—তোমার ছেলে সতীপদ ইংরাজীতে বড় কাঁচা, সুতরাং মেট্রিকিউলেসন পাশ করা দূরে থাকুক এলাউ হইতে পারে কিনা সন্দেহ। আমি বলিলাম "ওকথা শোনে কে? ছেলে পাশ করাইয়া দিতেই হবে"। তখন বলেন "আচ্ছা গ্রীষ্মের বন্ধের সময় উহাকে প্রত্যেক দিন বৈকালে আমার নিকট পাঠাইয়া দিও।" তাহাই হইল এবং সতীপদ ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া গেল। শ্রীমান্ হরিপদ ৪র্থ শ্রেণীতে উঠিয়া কেমন হইয়া গেল। Sir তাহা টের পাইয়াছেন। পরিশ্রমও করে অথচ পরীক্ষায় ফল ভাল হয় না। তারপর Sir বলিলেন "তুমি এক কাজ কর—তুমি শ্রীশকে ধর, সে ২।১ মাস একটু দেখিলে উহার দোষটুকু সারিয়া দিতে পারিবে।" তাই হ'ল, শ্রীশবাবু ২ মাস আন্দাজ সময় দেখিয়াই বলিলেন উহার ত্রুটি সারিয়া গিয়াছে, আর ঠেকিবে না। বাস্তবিকও তাহাই হইয়াছে। এই শ্রীশবাবুই এখন বরিশালে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন।

একবার আমার বড় ছেলে শ্রীমান্ শ্যামাপদ গুরুতর রোগাক্রান্ত হইয়া মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে ছিল। Sirএর এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত যতীনবাবু তখন ঐ কলেজে ৫ম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। Sir যতীন বাবুকে লিখিলেন "আমার অসুখ হইলে তুমি যতটুক যত্ন করিতে, আশা করি শ্যামাপদের জন্য তা অপেক্ষা একটুও কম করিবে না।"

কত যে প্রেম, কত যে ভালবাসা ছিল তা ত আর বলা যায় না। লিখিয়াত শেষ করা যায় না। এক পত্রে লিখিয়াছেন, এই জরাজীর্ণ দেহখানিকে সুস্থ ও সুখী রাখিবার জন্য তোমার আগ্রহ দেখিয়া চোখে জল আসিতেছে।

Sirএর ধারে বসিলে কি যে খাওয়াবেন তাহার ঠিক পাইতেন না। এক দিন বসিয়াছি Sir বলিলেন—অন্নদা! শোন শোন—

"নাহং দেহো জন্ম মৃত্যু কুতোমে।
নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসে কুতোমে।
নাহং চেতঃ শোকমোহৌ কুতোমে।
নাহং কর্ত্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতোমে ॥"

আর এক দিন বলেন—তীরবথ মে সব পানীহৈ, হোয়ে নহী কুচ অন্নায় দেখা। তারপর একটী গান বলিলেন—

সাধু ভাই জীবতহী কর আশা।
তন ছুটে শিব মিলন কহত হৈ সো সব ঝুটী আশা,
অবহু মিলা সো তবহু মিলেগো নহিত যমপুরবাসা।
সত্য গাহে সদ্‌গুরুকো চিনহে সত্ত নাম বিশ্বাসা,
কহৈ কবীর সাধন হিতকারী হাম্‌ সাধনকো দাসা।

বুঝলেত? এখানে যদি মিল্‌তে পার তবেই সেখানে গিয়ে মিলতে পারবে নচেৎ যমপুরে বাসা, এই দেহ অন্তেই যে মিলন হবে ও সকল আশা মিথ্যা।

একটা লক্ষ্য করিয়াছি, কোন রকম সাম্প্রদায়িকতা ছিলনা। যাহার মধ্যে যাহা ভাল পাইয়াছেন তাহারই প্রশংসা করিয়াছেন। এক দিন Sirকে জিজ্ঞাসা করি (মহাত্মার আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বে) Sir, আপনার ঘরে কলসীতে খাওয়ার জল অথচ মুসলমান ছেলেরা আসে, ইহাতে আপনার জাত যায় না? Sir বলিলেন দূর পাগল, ওতে কি জাত যায়রে?

একদিন সতীশবাবুর (৺স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) সহিত কথা হয়, তিনি বলেন ভগবান শুদ্ধবুদ্ধির গোচর এবং কেবল ধ্যানের গম্য। আমি বলি যে পরমহংস বলিয়াছেন "তাহাকে দেখা যায়, তুমি আমি যেরূপ কথা বলি এরূপ কথা বলা যায়।" সতীশবাবু তাহা

স্বীকার করেন না, তারপর Sirএর কাছে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—"ভগবান যখন সর্ব্বশক্তিমান তখন তিনি সকলই হইতে পারেন নচেৎ তাহার শক্তিকে সীমাবিশিষ্ট করিতে হয়। মৎস্য কুর্ম্মরূপেও তাহার আসিতে হইয়াছিল"। তারপর আবেগের সহিত বলেন "আমাকে আনিয়া তিনিও বিপাকে পড়িয়াছেন। আমার ভাবনা তাহারই ভাবিতে হইবে। জীবের যখন যেরূপ অবস্থা তখন সেরূপ হইয়া আসিতে হইয়াছে। জীবের মঙ্গলের জন্যই তিনি মৎস্য কুর্ম্ম বরাহ রূপে আসিয়াছেন।"

গত বৈশাখ মাসে পরলোকগত সাধক পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব-কৃত গীতাঞ্জলি হইতে শুক সারীর বিবাদের মত একটি গান করি। তাহাতে Sirএর আনন্দ দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ৩।৪ জন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে আমার দ্বারা ঐ গানটী গাওয়াইয়া শুনাইলেন। কি যে জিনিষ Sir উহাতে পাইয়াছিলেন তিনিই জানেন। গানটীর কিয়দংশ আমি নিম্নে লিখিলাম।

তন্ত্র বেদের বিষম বিচার মাকে লয়ে
মাকে লয়ে মাকে পেয়ে পেয়েও দেখি না পেয়ে।—

১। বেদ বলে ভ্রান্ত তন্ত্র মা বলিলে কারে ?
তন্ত্র বলে জন্মান্ধবেদ দেখতে না পায় যারে (তোমার অগোচরে)।

২। বেদ বলে নিরাকার মায় কে দেখেছে কবে ?
তন্ত্র বলে নিরাকারে মা সাকার প্রসবে (তুমি কোথাকার কে)।

৩। বেদ বলে আমি মায়ের নিঃশ্বাস নির্গত, ( নিঃশ্বাস নিরাকারের )
তন্ত্র বলে তাইতে তোমার বিকাশ ও ভাই এত।

৪। বেদ বলে মা যে বাক্য মনের অগোচরা,
তন্ত্র বলে, বলে থাকে কাজে কুঁ'ড়ে যারা (সাধন পদ না পেয়ে)।

৫। বেদ বলে তন্ত্র তন্ত্র বুঝে না পাই ভবে ;
তন্ত্র বলে যেখানে থাকে আপনি খুঁজে নেবে (খুঁজতে যাব কেন)।

৬। বেদ বলে বৃথা চেষ্টা সকলই ভাই মায়া ;
তন্ত্র বলে মায়ার মধ্যে হাসেন মহামায়া (এ যে মায়ের মায়া)।

৭। বেদ বলে মা যে আমার নির্গুণ স্বভাবা ;
তন্ত্র বলে গুণের সীমা দিতে যাবেন বাবা (তুমি আমি কেবা)।

৮। বেদ বলে ব্রহ্মের আমার কোন ক্রিয়া নাই ;
তন্ত্র বলে পর ব্রহ্ম শবরূপ তাই (মায়ের চরণ তলে)।
বেদ বলে কেন আর ভাই বিবাদ করি তবে,
তন্ত্র বলে আর কি দাদা বিবাদ সম্ভবে (ঐ দেখ চেয়ে)।
বেদ বলে আ মরি ভাই কি দেখিলাম ঐ
তন্ত্র বলে যা দেখলাম তা বলতে পারি কৈ (ভুলায় কোলে লয়ে)।
বেদ তন্ত্র চন্দ্র সূর্য্য দুটী কোলে নিয়ে ;
নব কাদম্বিনী কান্তি কালী বসিলেন হাসিয়ে (ব্রহ্মময়ী মেয়ে)।
ঘুমাইল দুজন এখন মা যে দেখি একা,
ঐ দশাই ভাই ঘটবে যে তার যার সনে মার দেখা
(শেষে মা বই আর নাই)।
বিচার বিবাদ তার কি থাকে মধ্যস্থ যার শ্যামা ;
শিবচন্দ্র বলে বাজল তন্ত্রের আনন্দ দামামা (জয় জয় শ্যামা রবে)।

Sirএর ভাব হৃদয়ঙ্গম করা আমার সাধ্যায়াত্ত নহে। ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসুর অঙ্গীকার আছে "অপরের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে নিজকে তাহার সমান মহত্ত্বের এক ধাপে উঠিতে হয়"। Sirত বলিতে বুঝাইতে কম করেন নাই কিন্তু আমরা তা ধরিতে পারি নাই।

---

জগদীশ—‘বিদ্যামন্দিরে’
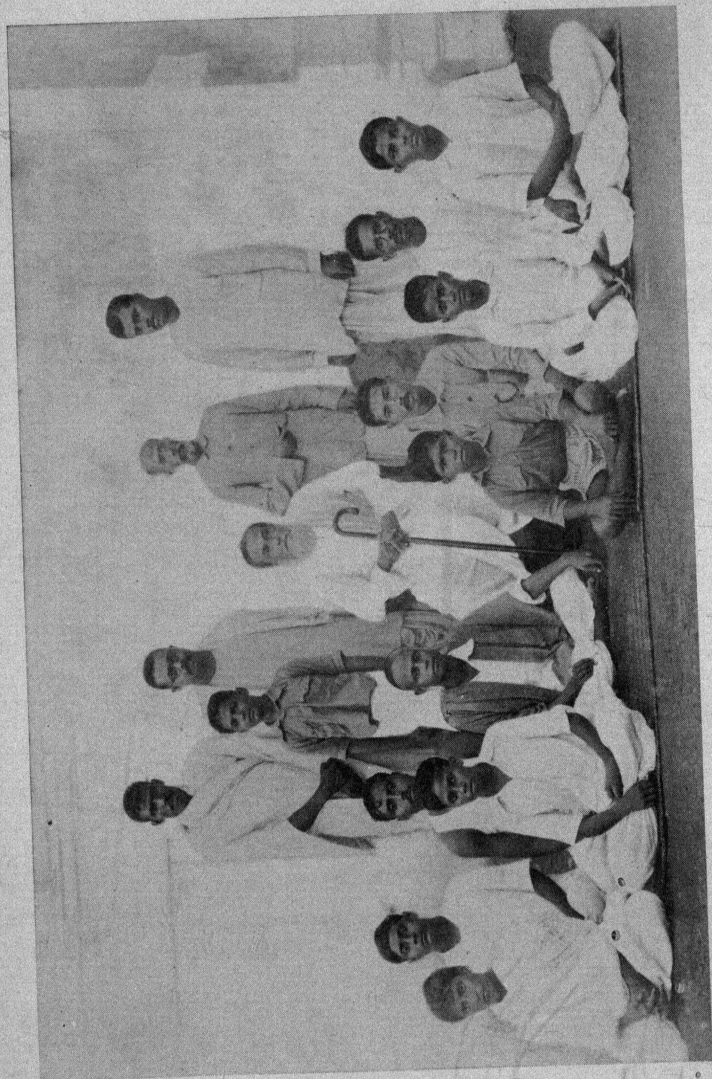
# "পিতা নোঽসি, পিতা নোঽসি"

জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত সৌভাগ্য ছিলই, তাহা না হইলে কেমন করিয়া আচার্য্যদেবের পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলাম? যে অধিকার লাভ করিয়াছিলাম, সে অধিকার যে কত বড়, কত দুর্লভ, তাহা কি আজ এই জীবনের অপরাহ্নেও উপলব্ধি করিতে পারিতেছি?

আশ্রমে স্থান পাইলাম। কিন্তু আচার্য্যদেবের পরিচয় পাইলামনা। মহাসমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া তাহার বিরাট গাম্ভীর্য্যে স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, 'মৃত্তিকার শিশুদের' জন্য যে তাহার উদ্বেল উচ্ছ্বাস তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। পারিবার বয়সও তখন ছিলনা। তাঁহাকে ভয় করিতাম, ভক্তি করিতাম, শ্রদ্ধা করিতাম, এমন কি, হয়ত পূজাও করিতাম—কিন্তু ভালবাসিতে সাহস হইতনা। এ যেন শ্বেতমর্ম্মরে খোদিত দেববিগ্রহ, রক্তমাংসে গঠিত মনুষ্য নহে।

কিন্তু একদিন পরিচয় মিলিল। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসেই থাকিতাম। পরীক্ষার পড়ায় আচার্য্যদেবের সাহায্যের জন্য গ্রীষ্মাবকাশে আশ্রমে আসিয়াছিলাম। ছুটি শেষ হইলে আশ্রম ছাড়িয়া ছাত্রাবাসে ফিরিয়া যাইবার আয়োজন করিতেছি, এমন সময়ে আচার্য্যদেব আমাকে ডাকিলেন, আস্তে আস্তে বলিলেন, 'তুমি যেওনা, তোমার জন্যে আমার একটু মায়া হয়েছে!' আজ জানি কথাটা মায়া নয়, দয়া—এ একজনের প্রতি স্নেহ নয়, সর্ব্বভূতে ভাল-

বাসা। তা সে মায়াই হউক আর দয়াই হউক, তাঁহাকে যেন চিনিলাম। প্রাণটা আমার জুড়াইয়া গেল। জগতের দুঃখ তাহা হইলে ঐ বুকে বাজে! এ প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তিমাত্র নয়। প্রস্তরের আবরণের অন্তরালে একটা প্রাণ আছে, যাহা জগতের দুঃখে নিরন্তর গলিয়া গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে!

আশ্রমে থাকিয়া গেলাম, আচার্য্যদেবের কুটীরেই থাকিবার স্থান হইল। তখন আমার সেই বয়স, যে বয়সে অজানার দুর্নিবার আকর্ষণে মানবচিত্ত ব্যাকুল হইতে চায়, জানায়—তার প্রাণ পূর্ণ করিতে পরেনা। কেউবা জ্ঞানের পথে, ভক্তির পথে ছুটিয়া যায়, আবার কেহবা কর্ম্মের প্রবল স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আমি ভক্তির পথ বাছিয়া লইলাম। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া পুষ্পচয়ন করিতাম, দেবমন্দির মার্জ্জনা করিতাম, বিগ্রহের পাদমূলে পুষ্পাঞ্জলি দিতাম, ভক্তিগ্রন্থ পড়িতাম, মৎস্যমাংস খাইতামনা, নিরামিষ আহার করিতাম। একদিন ডাকিয়া বলিলেন, 'গরীবের ছেলে, এটা খাবনা, ওটা খাবনা, এরকম করিলে চলেনা। যাহা মিলিবে তাহাই খাইবে, যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবে তখন যেরূপ ইচ্ছা খাইবে।' আর একদিন বলিলেন, 'গোবর দিয়া ঠাকুরঘর লেপা—ও তোমার কাজ নয়। ও কাজ যাদের তারা করিবে।'

আর একদিন ঘরের মধ্যে বসিয়া আছি, আচার্য্যদেব আর আমি। আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, 'তোমাকে আমি গায়ত্রী মন্ত্র দিতেছি, তুমি এই মন্ত্র জপ করিবে।' গায়ত্রী মন্ত্র জপ! কায়স্থ বংশে আমার জন্ম, নিজেকে শূদ্র বলিয়াই জানিয়াছি, ভাবিয়া আসিতেছি, গায়ত্রীমন্ত্র শ্রবণ করিলেও যে আমার মহাপাপ, জপ করাত দূরের কথা! 'না, সে আমার দ্বারা

হইবে না।'. দৃঢ় কণ্ঠে আচার্য্যদেব কহিলেন, 'আমি বল্‌ছি, তোমার কিছু মাত্র পাপ হবেনা।' তারপর ধীরে ধীরে মন্ত্র উচ্চারণ ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, আমি অভিভূতের মত শ্রবণ করিতে লাগিলাম। যুগ যুগান্তর ধরিয়া অধিকার-বঞ্চিত আজ আপনার অধিকার ফিরিয়া পাইল!

কিন্তু তথাপি চিত্ত শান্ত হয় না। কে আমাকে শান্তির পথ দেখাইবে? কোথায় গুরু, এই অন্ধকার পথে কোথায় আলো? আমার মনের এ অস্থিরতা আচার্য্যদেবের দৃষ্টি এড়ায়নাই। বার বার বলিয়াছেন, 'দেখ, কালীশের কাছে দীক্ষা লও।' আমি চুপ করিয়া থাকিতাম। কালীশচন্দ্রকে দেবতা বলিয়া জানিতাম কিন্তু প্রাণের ভিতরে গুরুর যে ছবি আঁকিয়াছিলাম, সে ছবি গৃহীর নহে, সন্ন্যাসীর। আমার মনের কথা তিনি পাঠ করিয়াছিলেন, বলিলেন, 'দেখ, কালীশ সামান্য মানুষ নয়, ও আমার চেয়ে অনেক ভাল, অনেক বড়।'

মনের অস্থিরতা বাড়িয়াই চলিল। গভীর রাত্রে একদিন সতীর্থ সঙ্গে প্রায় নিঃসম্বলে পুরীধামে পদব্রজে যাত্রা করিলাম। আঠার দিনে পুরীর সমুদ্রতটে জটিয়া বাবার আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। মঠধারী সন্ন্যাসীকে প্রার্থনা জানাইলাম, 'আমি দীক্ষা-প্রার্থী, আমাকে দীক্ষা দান করুন।' সন্ন্যাসী কহিলেন, 'বাবা, তোমার গুরু, আগে হইতেই স্থির হইয়া আছেন। গুরুর জন্য তোমাকে এখানে সেখানে ছুটাছুটি করিতে হইবেনা। তোমার যিনি গুরু, তিনি নিজে যাচিয়া তোমার ঘরে গিয়া তোমাকে দীক্ষা দিবেন। এখন ফিরিয়া যাও, লেখাপড়া শেষ কর। তোমাকে সংসারী হইতে হইবে কিন্তু ভয় নাই, সংসার

তোমাকে বাঁধিতে পারিবেনা, সংসার হইবে তোমার মুক্তির সোপান।'

আবার ফিরিয়া চলিলাম। পথের ডাকে যাঁহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, ঘরের ডাকে আজ তাঁহার কথা মনে পড়িয়া গেল। ভয় হইল, তিনি না জানি কত মন্দই বলিবেন, দুঃখ হইল, লজ্জা হইল, কত ব্যথাই না জানি তাঁহার বুকে বাজিয়াছে! দুঃখে, ভয়ে, সঙ্কোচে, আপনার অপরাধে সচেতন অপরাধীর মত আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম করিলাম। বুক তখনও দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছে। দেখা যখন হইল, প্রথমে চোখের দিকে তাকাইতে পারিলাম না। যখন পারিলাম তখন দেখিলাম, ক্ষমা-সুন্দর সেই চক্ষু অসীম স্নেহে ও করুণায় ছলছল করিতেছে, নিঃসংশয়ে বুঝিলাম চাহিবার পূর্ব্বেই ক্ষমা মিলিয়াছে! বলিলেন, 'পড়াশুনায় অনেক ক্ষতি হইয়াছে, এইবার মন দিয়া পড়া কর।'

এই আশ্রমে অবস্থান কালে আর একজন মহাপুরুষের স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। পৌষের দুরন্ত শীতে গভীর নিশীথে অর্দ্ধ পৃথিবী যখন নিদ্রায় অচেতন, তখন সেবাব্রত কালীশচন্দ্র কাঁধের উপরে কম্বলের বোঝা লইয়া বরিশাল সহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আর পথিপার্শ্বে, শিশিরবর্ষী উন্মুক্ত আকাশের তলে যেখানে যে হতভাগ্য অনাবৃত শরীরে শীতে কাঁপিতেছে, নিঃশব্দে দেবদূতের মত তাহার গায়ের উপর একখানি কম্বল রাখিয়া আর একজন হতভাগ্যের সন্ধানে ছুটিয়া চলিতেছেন। কালীশচন্দ্র আচার্য্যদেবের কি ছিলেন ও কতখানি ছিলেন বুঝাইয়া বলিবার সাধ্য নাই। মহাযাত্রার মহা মুহূর্ত্তে নিরশ্রুনেত্রে জগদীশ

উচ্চৈস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কালীশ, কি দেখ? কালীশ, কি দেখ? মরণ জয়ী প্রেমিক সাধক সুস্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিতেছেন—জগন্নাথ, জগন্নাথ!

আমার শৈশব ও বাল্যকাল চিরকুমার ব্রহ্মচারী তারিণী চরণ বসু মহাশয়ের স্নেহক্রোড়ে অতিবাহিত হইয়াছে। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে আচার্য্যদেবের চরণে আশ্রয় জুটিল। ব্রহ্মচারীর জীবন আমাকে আকর্ষণ করিত। একদিন আচার্য্যদেব বলিলেন, "ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস সাধারণ নিয়ম নহে, উহা নিয়মের ব্যতিক্রম। তোমরা যদি বিবাহ না করিবে, বিবাহ তবে করিবে কাহারা? বিবাহ করিবে, কিন্তু পণ গ্রহণ করিবে না।" বাবা পাগলচাঁদের আশ্রমে পাগলী মাও বলিয়াছিলেন, "বিবাহ করিবে। নিজে মেয়ে দেখিয়া পছন্দ করিবে, যে মেয়ের চোখ দুটি দেখিবে শান্ত নির্ম্মল, মুখে লক্ষ্মীশ্রী আছে, তাহাকে পছন্দ করিবে।"

সত্যকে তিনি ভালবাসিতেন কিন্তু সে ভালবাসা যে কতখানি তাহার আভাস পাইবার সুযোগ একদিন ঘটিয়াছিল। বাল্যাশ্রমের সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বেলুড় মঠ হইতে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ, নির্ম্মলানন্দ ও অম্বিকানন্দজী আসিয়াছেন। ক্ষুদ্র সহর আনন্দের বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। একদিন প্রশ্নোত্তর সভায় তুলসী মহারাজকে ( নির্ম্মলানন্দজী ) প্রশ্ন করা হইল, "আমার জীবন বিপদাপন্ন, সত্য কথা বলিলে, মৃত্যু অনিবার্য্য, একটি মিথ্যা কথা বলিলে জীবন রক্ষা হইতে পারে। আমি কি মিথ্যা বলিতে পারি?" স্বামীজি বলিলেন, 'পণ্ডিতেরা বলেন এ ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা যাইতে পারে।' হঠাৎ আচার্য্যদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পণ্ডিতেরা কি বলেন তা নয়, আপনি কি বলেন? এমন অবস্থায় পড়িলে

আপনি কি করিতেন?' স্বামীজি হাসিয়া উত্তর করিলেন 'আমি সন্ন্যাসী ফকির মানুষ, আমার জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? আমি চোখ বুজিয়া সত্য কথাটাই বলিয়া ফেলিতাম!' উত্তর শুনিয়া ঈপ্সিত দ্রব্য প্রাপ্তিতে ক্ষুদ্র শিশু যেমন আহ্লাদে নাচিয়া উঠে এই 'সমুদ্র ইব গম্ভীর' মহাপুরুষের প্রাণও তেমনি নাচিয়া উঠিল। তিনি সহজ আনন্দে হাতে তালি দিতে লাগিলেন। বাতাস না হইলে কোন জীব বাঁচিতে পারে না, সত্য ছিল আচার্য্যদেবের জীবনে বাতাসেরই মত প্রয়োজনীয়।

একবার ব্রজোমোহন বিদ্যালয়ে, যতদূর মনে পড়ে জন্মাষ্টমীর দিনে, শ্রীকৃষ্ণের জীবন আলোচনার জন্য এক সভা আহূত হয়। সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জোরের সহিত বলিতে লাগিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই স্বয়ং ঈশ্বর নহেন, তিনি আদর্শ মনুষ্যমাত্র—" আচার্য্যদেব সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সহসা বিদ্যুতের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া গদগদকণ্ঠে অনর্গল একশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন, "I cannot accept this faith. I know Him to be my God. I have felt Him in my life. I have tasted Him." (আমি একথা মানিতে পারি না। আমি জানি শ্রীকৃষ্ণ আমার ঠাকুর। আমি তাঁহাকে আমার জীবনে অনুভব করিয়াছি। আমি তাঁহাকে আস্বাদ করিয়াছি!) শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর ঠাকুর, আর তাঁহারই 'মুখপদ্মাৎ বিনিঃসৃত' গীতার ধর্ম্মই ছিল তাঁর ধর্ম্ম।

আচার্য্য দেবের মুখে গীতার ব্যাখ্যা শুনিতাম। 'কুরুক্ষেত্র' শব্দটীর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন—এই জীবনই কুরুক্ষেত্র, 'কুরু' 'কুরু' 'কুরু'—কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর—অবিরাম এই ধ্বনি

উঠিতেছে। জীবনের এই কুরুক্ষেত্রে কাহারও কর্ম্ম না করিয়া বসিয়া থাকিবার অধিকার নাই।

কর্ম্মব্রতেই দীক্ষা লইলাম। আচার্য্য কালীশচন্দ্র আদর করিয়া নাম দিলেন 'কর্ম্মানন্দ।'

হে যন্ত্রি, আমার এই জীবন যন্ত্র দিয়া তুমি তোমার কোন্ কাজ করাইয়া লইবে ?

ফাষ্ট´ আর্টস্ পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় চলিলাম। সঙ্গে চলিল বারজন 'ব্রতী।' আচার্য্যদেব আশীর্ব্বাদ করিলেন। নূতন সমুদ্রে জীবনতরণী ভাসাইলাম। কাণ্ডারী, কূল মিলিবে কি ?

মহৎজীবনের সংস্পর্শে না আসিলে মনুষ্য জীবন যে কি অমূল্য সম্পদ, তাহা উপলব্ধি করা যায় না। আচার্য্যদেবের চরণতলে বসিয়া বুঝিলাম, অথবা বুঝিলাম বলিয়া ভাবিলাম, আমার জীবন কি, এবং এই জীবনের দায়িত্ব কতখানি।

*　　　*　　　*　　　*

প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে নৌকা ছুটিয়া চলিয়াছে। পাহাড়ের সমান উঁচু হইয়া চারিদিক হইতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিতেছে কিন্তু চিত্ত নির্ভয়। আচার্য্যদেব বলিয়াছিলেন, 'জীবনের কুরুক্ষেত্রে 'সারথির' ধ্যান করিবে। জীবন রথের রশ্মি ধরিয়া আছেন সেই অচ্যুত সারথি।' ভাবিবার চেষ্টা করি, যতটুকু ভাবিতে পারি, তাহাতেই হৃদয় সাহসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

বিবাহ করিয়াছি, পণগ্রহণ করি নাই। কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে। বিবাহ করিয়া মনে হয় নাই বন্ধনে জড়াইয়া পড়িয়াছি। স্ত্রী প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর মত সর্ব্ব কর্ম্মে আশা ও উৎসাহ দিতেছেন, ক্লান্ত বাহুতে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন।

১৯২৬ সালে আচার্য্যদেব কলিকাতা মহানগরীতে 'পান্নালাল শীল বিদ্যা মন্দিরের' ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিলেন। যৌবনের সাথী 'ব্রতীরা' আসিয়া জুটিলেন। কলিকাতার সুবিখ্যাত দানশীল জমীদার ৺মতিলাল শীল মহাশয়ের সুযোগ্য বংশধর ৺মাণিকলাল শীল মহোদয় তদীয় পিতৃদেবের পুণ্যস্মৃতিরক্ষাকল্পে এই বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালায়ের আদর্শে এই বিদ্যামন্দির পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেছি। আচার্য্যদেবের যে স্নেহদৃষ্টি এই মন্দিরের উপর ছিল তাহাতে মনে হয় তাঁহার স্বহস্তরোপিত এই ক্ষুদ্র বৃক্ষ একদিন মহা মহীরুহে পরিণত হইয়া শত শত শ্রান্ত পথিককে ফল ও ছায়া দানে শীতল করিবে।

বাস করিবার জন্য মাণিকতলায় জায়গা খরিদ করিয়াছি। আচার্য্যদেব বলিলেন, 'এখানে তোমার বাস করা হইবে না। তুমি তোমার দমদম-নারায়াণপুর বাগানে গিয়া বাস কর।' নারায়ণপুর তখনও বাসের যোগ্য হয় নাই, ম্যালেরিয়ার ভয় আছে। সেইখানে বাস করিতে হইবে! কিন্তু আচার্য্যদেবের সেই ধীরে উচ্চারিত বাক্য কয়টি আজ দুর্লঙ্ঘ্য আদেশের মতই মনে হইতেছে। ধীরে ধীরে সেই পল্লী আজ 'নারায়ণপুর কলোনীতে' পরিণত হইয়াছে। বন্ধু বান্ধবগণ আসিয়া ধীরে ধীরে জুটিতেছেন। আচার্য্যদেব স্বয়ং এখানে কিছুদিন বাস করিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই স্থানটী আমার বড় ভাল লাগে, ভারী সুন্দর!'

কেন যে তিনি আমাকে এই শ্যামল পল্লীকুঞ্জে টানিয়া আনিলেন, এখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছিনা কিন্তু একটু একটু আভাস পাইতেছি। নারায়ণপুরকলোনীতে 'কালীশচন্দ্র স্মৃতি-

পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির

মন্দিরে' বসিয়া আচার্য্যদেব 'অমৃত সমাজের' অভিষেক করিয়াছিলেন। অমৃত সমাজে সকল হিন্দুর সমান অধিকার। ব্রাহ্মণ নয়, কায়স্থ নয়, ক্ষত্রিয় নয়, চণ্ডাল নয়—সকলেই হিন্দু, ভাই ভাই। সকলেই দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে। জন্মগত বৈষম্য এই সমাজ স্বীকার করে না। গীতার ধর্ম্মই ইহার ধর্ম্ম, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' এই বাক্যই ইহার মন্ত্র। সমাজের অনুষ্ঠান-পত্র যখন রচিত হয়, তখন আচার্য্যদেব নিজ মুখে বলিয়াছিলেন, 'লেখ, এই সমাজে কুলকৌলীন্যের কোনও স্থান নাই।'

এক অখণ্ড হিন্দু সমাজের তিনি স্বপ্ন দেখিতেন। অমৃত সমাজ সেই স্বপ্নকে মূর্ত্তি দিবার প্রয়াস মাত্র। সমাজ তাঁহার আশীর্ব্বাদ পাইয়াছে, যুগযুগান্তর এই গঠন কার্য্যে লাগিবে, কিন্তু আমাদের কাজ—কর্ম্ম করিয়া যাওয়া, ফলাফল তাঁহারই হাতে।

জীবনে কোন দিন সাধন ভজন করিনাই। আচার্য্যদেবের কৃপালাভ করিবার মত কিছুই সম্বল আমার ছিলনা। তাঁহাকে ত ভুলিয়াই ছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে ভুলেন নাই। শেষ বারে যখন কলিকাতা আসিলেন তখন, জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পুণ্যফল, না তাঁহার অহেতুক কৃপা জানিনা, আমার গৃহেই উঠিলেন। সেবা করিতে কোনও দিন শিখিনাই, তাই রোগ লইয়া আসিলেন আমাকে সেবা শিখাইতে। আমার ঘরে আনন্দের মেলা বসিয়া গেল। দিন রাত ভক্তমণ্ডলীর আসা যাওয়া। কি স্বর্গই আমার গৃহে নামিয়া আসিল! রোগ শয্যায় থাকিয়াই একদিন শোভাকে ও আমাকে রুদ্ধদ্বারগৃহমধ্যে দীক্ষা প্রদান করিলেন। পুরীধামের সাধু বাবার বাক্য আজ সফল হইল—'বাবা, তোমার যিনি গুরু, তিনি নিজে যাচিয়া তোমার ঘরে গিয়া তোমাকে দীক্ষা দিবেন।'

দীক্ষা শেষ হইলে বলিলেন, 'আজ হইতে তোমরা আমার পুত্র কন্যা হইলে। পিতার মৃত্যুর পরে সন্তানের যে কর্ত্তব্য, তাহা তোমারা করিবে।'

হায়! তখন কি জানিতাম বিদায়ের দিন এত সন্নিকট হইয়া আসিয়াছে?

একদিন বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে শোভা ও আমি। তাঁহাকে মধ্যে রাখিয়া আমরা পাশে পাশে যাইতেছি। শোভা মাঝে মাঝে সরিয়া দূরে যাইতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও কি? দূরে সরিতেছ কেন?' শোভা বলিল 'আপনার ছায়ায় পা পড়িবে যে!' ধীরে ধীরে হাসিয়া বলিলেন, 'গুরুর ছায়ায়ই ত চলিতে হয়।'

একদিন বলিলেন, 'এই পার্কটা ঘুরিতে ১৮০০ step লাগে, lake এ যেতে ২৩০০ step লাগে।' শশী বাবু সঙ্গে ছিলেন, বলিলেন, 'আরত বসিয়া বসিয়া কাজ নাই। ততক্ষণ জপ করিলেও কাজ হয়।' তিনি ঈষৎ হাসিয়াছিলেন, আমার তখন রামপ্রসাদের গানের একটি চরণ মনে হইয়াছিল 'নগর ফির মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।'

ডাক্তারদের বলিয়া দিয়াছিলাম, 'দেখুন, ইঁহার চক্ষু, হৃৎপিণ্ড বা স্বাস্থ্যের কোনও খারাপ খবর ইঁহাকে জানাইবেন না।' তাহারা বলিয়াছিলেন, 'চিকিৎসা শাস্ত্রে বা দেহবিজ্ঞানে আমাদের যতটা অধিকার, ইঁহার তাহা অপেক্ষা বেশী ছাড়া কম নয়, ইঁহার নিকট কিছু লুকাইবার চেষ্টা বৃথা।'

আমি তখন পঞ্জিকা সংস্কারের প্রয়োজন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। নূতন পঞ্জিকার ভূমিকায় তাঁহার নিজের হাতের

স্বাক্ষর দিয়াছিলেন—তাহাতে লেখা ছিল, 'মঘা অশ্লেষা অশুভ নয়, ভগবানের নাম লইয়া যে দিন আরম্ভ হয় সেই দিনই শুভ, আর ভগবানের নাম বিরহিত যে দিন সেই দিনই দুর্দ্দিন, সেই দিনই অশুভ। ফলিত জ্যোতিষের উপর অতি নির্ভর করিয়া হিন্দু জাতি মরণের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, অমৃত সমাজ হিন্দুকে মরিতে দিবেনা।'

তারপর একদিন আচার্য্যদেব বলিলেন, 'একবার বরিশালে যাইব।' তখনও অসুখ সারেনাই। প্রাণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে চায়না। কিন্তু মনকে প্রবোধ দিলাম, এ ত আমার একার জিনিষ নয়, এখানে আটকাইয়া রাখিবার আমার কি অধিকার আছে?

যাইবার দিন স্থির হইল। প্রাতে গাড়ীতে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন, 'আজকার দিনে যাত্রাকরিলে পঞ্জিকার মতে কি ফল হয় জান? আর ফিরিয়া আসা যায় না।'

আমার বুকের মধ্যে ছাৎ করিয়া উঠিল, বলিলাম, 'ওরূপ কথা বলিলে আপনাকে কিছুতেই যাইতে দিবনা।' বলিলেন, 'তবে না কি তুমি পঞ্জিকা মাননা? ছিঃ মন খারাপ করিতে নাই। ভগবানের নাম লইয়া যাত্রা করিলে সব অশুভ শুভ হইয়া যায়।'

তারপর একদিন মধ্যাহ্নে, যখন মাথার উপর সূর্য্য জ্বলিতেছিল, আমার ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। দীনের কুটীরে যে আনন্দের মেলা বসিয়া ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। আচার্য্যদেব বরিশালে চলিয়া গেলেন।

পূজার ছুটিতে হঠাৎ বরিশাল হইতে তার পাইলাম, 'অবস্থা ভাল নয়, শীঘ্র এস।' বিঠু আর শোভাকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলাম। আমাকে ও শোভাকে দেখিয়া খুসী হইলেন। দেহের উর্দ্ধে অবস্থিত এই পুরুষ কোনও দিন দেহকে তুচ্ছ বা অযত্ন

করেন নাই। দেহ ছিল তাঁহার কাছে আরাধ্য দেবতার মন্দির। তাই শেষ মুহূর্ত্তেও যখন বুঝিয়াছেন, ঔষধের প্রয়োগে কোনও ফল হইবেনা, তখনও শান্তভাবে ঔষধ সেবন করিয়াছেন, ইন্‌জেকসন নিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন।

ভীষণ রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার ধৈর্য্য চিকিৎসক মণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। আত্মারাম এই পুরুষ নিজের ভিতরে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিলেন। দেহ দেহের ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিল, আত্মা সাক্ষী হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

সেবা, ঔষধ, পথ্য, সমস্ত ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন উঠিলেই বলিতেন, 'ও হরিদাস জানে।' এতবড় গৌরবের অধিকার আমায় দিলে, পিতা!

দেহের চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিন্তু যাহাকে দেহের মধ্যে ধরিয়া রাখিবার জন্য এই বিপুল প্রয়াস, তিনি কোথায়? দেহধর্ম্মী আমরা কেমন করিয়া বুঝিব?

১৯৩২ সনের ১০ই নভেম্বরের প্রভাত আসিল। অসহ্য রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও শান্ত প্রসন্ন সেই মূর্ত্তি। স্নেহময়ী জননীর নিরাপদ ক্রোড়ে নিদ্রিত শিশুর মত সেই মুখ মণ্ডল নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ত। মহা প্রস্থানের আয়োজনের ব্যস্ততার কোনও চিহ্ন সে মুখে নাই। সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছেন, ডাক আসিলেই হইল। অপরাহ্ন বেলা তিন ঘটিকার সময় সেই ডাক আসিল। ডাক যখন আসিল, যাত্রা করিতে তখন এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইলনা।

সব শেষ হইয়া গেল! যে মহা রহস্যের মাঝে ডুব দিলে মানুষকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, আচার্য্যদেব সেই চিরন্তন অনাদি রহস্যের মাঝে লুকাইলেন। পশ্চাতে পড়িয়া রহিল মৃত্যু ও আঁধারের দেশ, আচার্য্যদেবের শুভ্র অমল আত্মা আজ দিব্য আলোকের দেশে
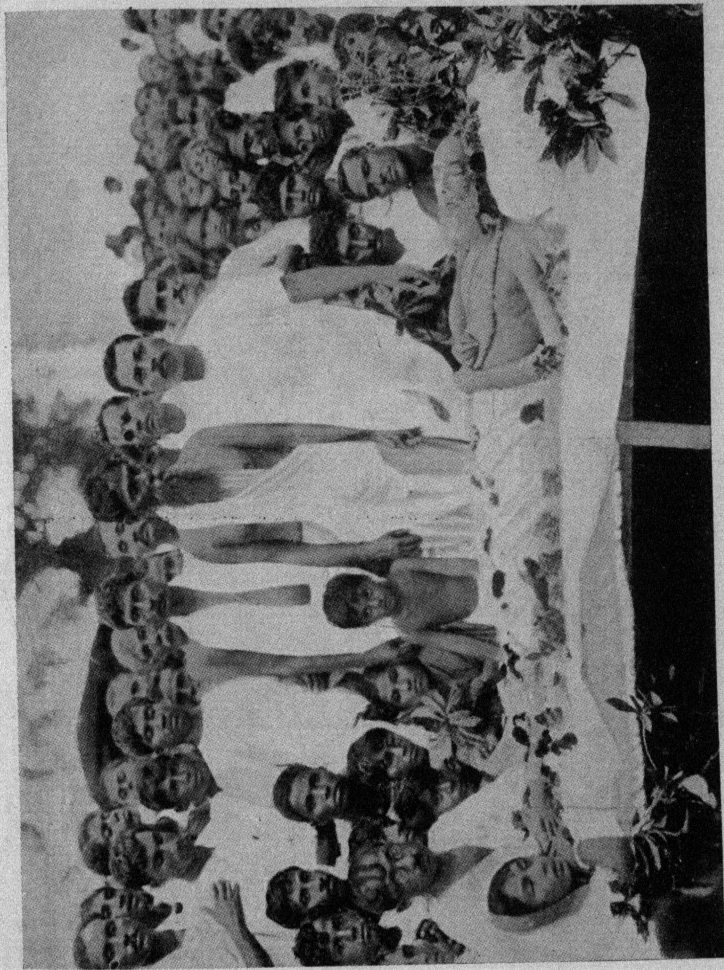
ব্রহ্মর্ষি জগদীশের মহাপ্রয়াণ
বৃহস্পতিবার, ১০ই নভেম্বর, ১৯৩২

অমৃতধামে যাত্রা করিল। আমাদের ক্রন্দন অশ্রুজল আর তাঁহাকে স্পর্শ করিবেনা ! করিবে না কি ? তাহা হইলে কি লইয়া থাকিব ?

'পাবনাৎ পূরণাচ্চ পুত্রঃ।' একদিন অহেতুক করুণায় পুত্র বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলে। হে পিতা, উর্দ্ধলোক হইতে আশীর্ব্বাদ কর, আজ হউক, কাল হউক, লক্ষ জন্ম পরে হউক, একদিন যেন সত্য সত্যই বলিতে পারি—'পিতা নোঽসি, পিতা নোঽসি।'

# আচার্য্য বাণী

১। কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যে জীবন ছিল, তারপরেও যদি জীবনে একটু পরিবর্ত্তন না আসে, জীবন যেখানে ছিল সেখান থেকে যদি একটু এগিয়ে না যায়, তাহা হইলে সে অনুষ্ঠানের মূল্য কিছু নাই।

২। তাঁকে ভালবাসাই চরম কথা। এই ভালবাসা হইলে সাধনা নিজে নিজে হইতে থাকে। শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান, জপ, এই সাধনারই অঙ্গ। যাকে ভালবাসি তার কথা শুনিতে ভাল লাগে, বলিতে ভাল লাগে, কেবল ইচ্ছা করে তার নাম ধরিয়া ডাকি, তাকে ভাবি।

৩। আমি তাঁহার দিকে চলিতেছি, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত শান্ত হয়, শান্ত হইলে তবে উপাসনা হয়।

৪। সংসারে দুঃখ আছেই। মানুষের কাছে দুঃখ জানাইয়া ফল কি? তাঁহার কাছে দুঃখ জানাও, তিনি সকল দুঃখ মুছিয়া দিবেন।

৫। আনন্দ হইলেই ক্ষরণ—Secretion হয়—উহা দুর্ব্বলতা। চোখের জল এক প্রকার nervous weakness. Feeling suppress করিতে না পারিলে কর্ম্ম করা যায় না। এখন কর্ম্মের যুগ। Will cultivate করিতে হইলে feeling suppress কর।

৬। সংসার তাঁর, সমাজ তাঁর, কর্ত্তা তিনি, সবই করাইয়া লইবেন। ভুল করা মানুষের স্বভাব, ভুল সংশোধন তিনিই করিবেন। আমরা শুধু বলি 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।'

৭। গ্রামের সখের থিয়েটারে কেউ রাম, কেউ রাবণ সাজিবে। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল তুমি কি সাজিবে? আমি বলিলাম,
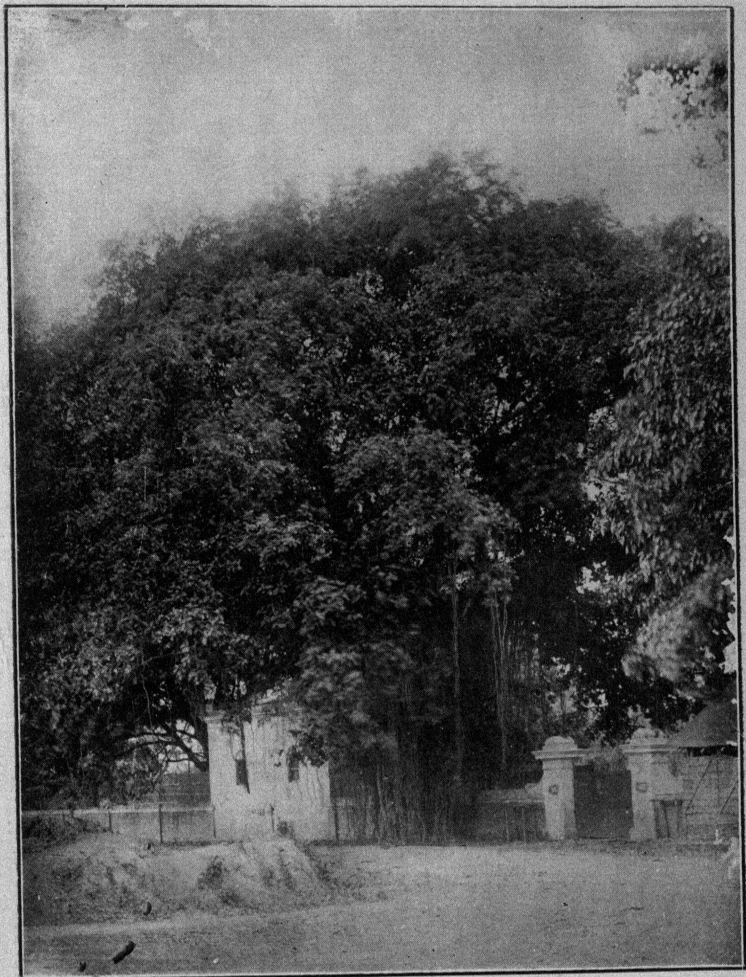
'শবরী বনাশ্রম'
নারায়ণপুর-কলোনী, দমদম

আমি তামাক সাজ্‌বো। তাহাতেই দলের হেড্‌ হইয়া গেলাম। বড় হইতে হইলে ছোট হও, পায়ের তলায় মাথা রাখ।

৮। আমি কে একবার বুঝিতে পারিলে আর নৈরাশ্য আসিবে না।

৯। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম এখন দৈব। ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কর্ম্ম, অতীতের সমস্ত ক্রিয়া পুঞ্জীভূত পিণ্ডীকৃত হইয়া এখন দৈব। দেখিনা, তাই দৈব। প্রবল পুরুষকার প্রতিকূল দৈবকে প্রতিহত করিতে পারে। স্রোতে ভেসে চলেছ—দৈব, উজানে ফিরিতেছ—পুরুষকার।

১০। অহল্যা পাষাণী মানুষ হইতে পারে। নিজে না পারি, রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে হইতে পারে। জগাই মাধাই চিরদিন থাকিব না। কিন্তু ভগবান্‌কে ডাকিতে হইবে, ভগবান্‌কে ডাকাই সব চেয়ে বড় পুরুষকার।

১১। ভগবানের স্থান কোথায়, যদি সবই কর্ম্মফল হয়? কর্ম্ম plus স্বাধীন ইচ্ছা—না হ'লে God is dead to me.

১২। Steamer, train wrecked হয়। Titanicএ কি সকলের অদৃষ্ট এক সূত্রে গাঁথা ছিল? ঈশ্বরের ইচ্ছা সকলের উপরে। কর্ম্ম ও তার ফল—কি কর্ম্মে এই দুর্গতি, এত খতাইয়া আমার কি লাভ? ঈশ্বরেচ্ছায় সব হয়, এতে আশ্বস্ত থাকা যায়।

১৩। একই প্রাণ সমগ্র বিশ্ব ব্যেপে রয়েছে। আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ সেই মহাপ্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে। এই প্রাণকে যে দেখেছে তার আর বন্ধন নেই, সে মুক্ত।

১৪। এত যে গ্রহ নক্ষত্র সর্ব্বদা ঘুরিতেছে ফিরিতেছে তাহাতে পরস্পর সংঘর্ষ হয় না কেন?—ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া চলে বলিয়া। কেহ দুই হাত, কেহ তিন হাত ব্যাসার্দ্ধ লইয়া বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া আছি

বলিয়া পরস্পরের সংঘর্ষ হয় কিন্তু ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া থাকিলে আর কাহারও সঙ্গে কাহারও সংঘর্ষ হয় না। তাঁহাকে কেন্দ্র করিলে আর বৃত্ত অঙ্কিত হয় না, সব straight line হইয়া যায়।

১৫। কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই। ভাল হউক মন্দ হউক, যে যেভাবে আছে তাহা নষ্ট হইলে তার প্রাণ শূন্য হইয়া যায়।

১৬। ভগবান কেবল kind নন। তিনি just and kind—যে যতটুকু পাপ করিয়া আসিয়াছে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবেই।

১৭। কাঁচা পাতা গাছ হইতে ছিঁড়িতে গেলে ভয় হয় হাড় মাংসে টান লাগিবে কিন্তু পাকা পাতাটা নিজে নিজেই পড়িয়া যায়। বাসনা কামনা কেবল মনের উপর কাজ করে এমন নয়, হাড় মাংস গুলিকেও যেন পরস্পরের সঙ্গে আট্‌কাইয়া ফেলে। যৌবনে বৈরাগ্য দ্বারা এ সব শিথিল হইয়া পড়ে। তখন আর এখান হইতে যাইতে কষ্ট হয় না, পাকা পাতাটির মত টপ্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িয়া যায়।

১৮। সহিষ্ণুতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। সংসারে বল, আর ধর্ম্মজগতে বল, সব জায়গায়ই সহিষ্ণুতা একান্ত আবশ্যক।

১৯। আমরা সব বিষয় বুঝিতে পারিনা কিন্তু সর্ব্বত্রই ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা।

২০। যে সহিষ্ণু, নিরভিমান ও সর্ব্বদা পরের মঙ্গল করে সেই যথার্থ সুন্দর।

২১। প্রার্থনায় কিছু ফল হয় কিনা তা দিয়ে কাজ কি? কেবল দেখবে এতে তোমার প্রাণ উন্নত হয়। আ'র ঠাকুর যা করবার তা করবেনই কিন্তু 'পরের মঙ্গল চাই' এই প্রার্থনায় ঠাকুরও খুব সন্তুষ্ট হন। এই যে ঠাকুর সন্তুষ্ট হন, এর চেয়ে আর অধিক ফল কি চাও?

২২। সংযম ও বৈরাগ্যপ্রধানদের জন্য যোগ এবং জ্ঞানপথ, আর চিত্ত মলিন, সংযম ও বৈরাগ্য লাভের ইচ্ছা আছে এমন যারা, তাদের জন্য ভক্তিপথ। ভক্তিপথ কলিতে সহজ। ভক্তিহীন নাম করায় পাপক্ষয় হয় কিন্তু পুনঃ পাপের সম্ভাবনা থাকে, আর ভক্তিসহ নামে পুনঃ পাপের সম্ভাবনা থাকে না। ভক্তি ব্যতীত সংযম বৈরাগ্যও দাঁড়ায় না।

২৩। আমার খুব পিপাসা হইয়াছে, তুমি এক গ্লাস জল দিলে, এখন এস্থলে যদি তোমার কৃপা মনে করি তবে প্রাণ শীতল হয়, সরস হয়। কর্ম্মফল মনে করিলে প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়। সর্ব্বত্র কৃপা দর্শন করিতে হয়।

২৪। কর্ম্ম এবং উপাসনা দুইই রাখিতে হইবে। শুধু কর্ম্ম লইয়া থাকিলে অন্ধকার, শুধু উপাসনায় আরও অন্ধকার। চিত্তে অনেক কর্ম্মের বীজ আছে অথচ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কোন উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে চিত্তের সে ময়লা কাটিবে কেমন করিয়া? তাই কর্ম্ম ও উপাসনা উভয়েরই দরকার।

২৫। যাবতীয় বস্তুর বুক চিরে তাঁকে বাহির কর। সব জিনিষের ভিতরে তাঁকে খুঁজিয়া বাহির কর। 'সূর্য্য, তোমার কিরণ সরাও, তাঁকে দেখতে দাও। আমার দেবতাকে কেন তুমি লুকিয়ে রেখেছ? আমার জিনিষ কেন আমাকে তুমি দেখতে দিবে না?' এইরূপ সব জিনিষের মধ্য হইতে তাঁকে নিঙ্ড়িয়ে বাহির কর।

# বংশ তালিকা

## পিতৃবংশ
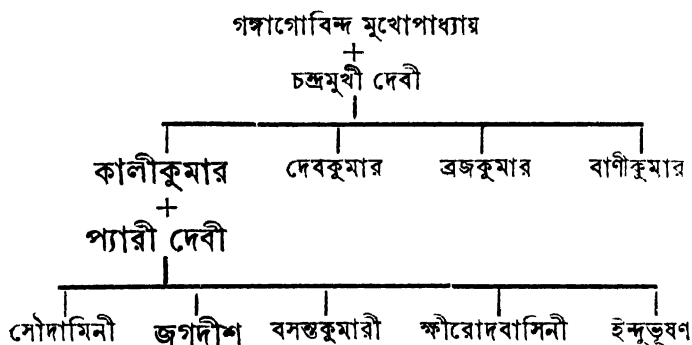
## মাতামহ বংশ
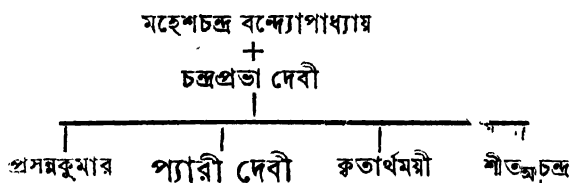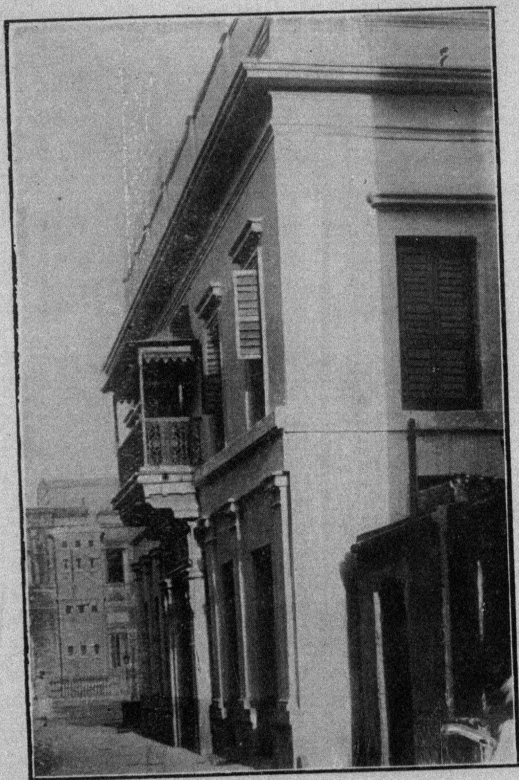
অমৃত সমাজ হল

# 'অমৃতের' শ্রদ্ধাঞ্জলি

## ব্রহ্মর্ষি জগদীশ

ব্রহ্মর্ষি জগদীশ আজ মরজগতে নাই। আদর্শ পণ্ডিত, আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ মানব, আদর্শ ভক্ত ও ঋষি আজ লোক-চক্ষুর অন্তরালে চিরকালের জন্য লুকাইয়াছেন। পরমহংসদেব যাঁহাকে কাঁচাসোণা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, সিদ্ধ মহাপুরুষ সোণা-ঠাকুর যাঁহাকে একদিন না দেখিলে অস্থির হইতেন, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার যাহাকে স্নেহরসে অভিষিক্ত করিয়া চিরজীবন শক্তির সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি আজ অমৃতলোকের অধিবাসী। তাঁহার কথা শুধু মনে পড়ে, মনে পড়ে তাঁহার অফুরন্ত করুণার কথা, অহেতুকী ভালবাসার কাহিনী। মনে হয় যেন সেই অপার করুণাময় বুদ্ধ আবার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপযুক্ত ছাত্র জগদীশ বাল-বিধবার দুঃখে চির-ম্রিয়মান ছিলেন, অনুন্নত জাতির দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা কাতর হইতেন। তাঁহার জীবন 'একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' এই বেদবাক্যের সম্যক্ স্ফুরণস্থল ছিল। বৈরাগ্যের দিব্যজ্যোতিতে চির-ভাস্বর আদর্শ গুরুকে আজ আমরা আমাদের প্রাণের গভীর শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছি। দক্ষিণামূর্ত্তি স্তোত্রের ভাষায় বলি—

মৌনব্যাখ্যা-প্রকটিত-পরব্রহ্মতত্ত্বং যুবানং
বর্ষিষ্ঠান্তেবসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ।
আচার্য্যেন্দ্রং করকলিতচিন্মুদ্রমানন্দরূপং
স্বাত্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্ত্তিমীড়ে॥

—যিনি মৌন ব্যাখ্যা দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব প্রস্ফুটিত করিতে তৎপর, যিনি চিরযুবা, যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, বয়োবৃদ্ধ শিষ্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত, যিনি আচার্য্য-শ্রেষ্ঠ, যাঁহার জ্ঞান করতলগত, যিনি আনন্দস্বরূপ, আত্মাতেই যিনি রমণ করেন, যাঁহার মুখ সতত হর্ষান্বিত এইরূপ কৃপাময় গুরুমূর্ত্তিকে স্তব করি।

যিনি জীবনে অমানীকে মান দান করিয়া সর্ব্বদা সুখী হইতেন, ধৈর্য্যসম্পদে ধরিত্রীকেও হার মানাইয়াছিলেন, ভীষণ রোগযন্ত্রণার ভিতরেও যাঁহার সহিষ্ণুতা চিকিৎসকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিত, সেই সর্ব্বদা হরিনামকীর্ত্তনপরায়ণ, প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠকে আজ অমৃতলোক হইতে আমাদের শ্রদ্ধা গ্রহণের জন্য আহ্বান করিতেছি। তিনি শান্তিধামের অধিবাসী হইয়া আমাদের শিরে স্নেহাশীষ বর্ষণ করিতে থাকুন —এই আমাদের গভীর প্রার্থনা। ওঁ শান্তি ওঁ!

—'অমৃত' অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯।